সদ্ধর্মের পুনরুত্থান

শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির

কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে "হৃদয়ের দরজা খুলে দিন" বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু। কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর "kalpataruboi.org" নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Rahul Bhikkhu

শাসন-বংশ সম্বন্ধে অভিমত

Shasana-Vansha.

This is a translation in Bengali of a Pali-book of the same name written by Prajuaswami of Sangharaj Viher of Mandalay. It is a history of original Buddhism. The original author collected materials from various sources but dealt mainly with the spread of Buddhism at Burma. The translator is the head of Nalanda Vidya Bhavan, Calcutta and a great Pali Scholar. He has rendered a signal service to the country by this translation. All who are interested in Buddhism will find the book useful.

Hindusthan Standard

26th April, 1964

"আপনার স্নেহোপহার প্রদত্ত 'শাসন বংশ' গ্রন্থখানি পাইয়াছি। আমি অশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। আমি কৃতজ্ঞ হৃদয়ে আপনাকে প্রচুর শ্রদ্ধাপূর্ণ ধন্যবাদ দিতেছি। বইখানি বহু প্রয়োজনীয় তথ্যপূর্ণ ও বড়ই কৌতুহল উদ্দীপক। আপনার সুনিপুণ হস্তে পরিয়া বইখানির বঙ্গানুবাদ অতি সরল ও হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে।"

স্বাক্ষর শ্রীমহিমচন্দ্র বড়ুয়া

১৬, নন্দন কানন ফার্ষ্ট লেন, চট্টগ্রাম।

১১-৯-৬৪ ইং

'অধিমাস-বিনিশ্চয়' সম্বন্ধে অভিমত

"আপনার প্রেরিত 'অধিমাস বিনিশ্চয়' নামক অধিমাস বর্ষ পঞ্জিকা খানা পাইয়া আনন্দিত হইলাম। আপনার পরিশ্রম সার্থক হইয়াছে। এরূপ পুস্তক বিরল। বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজে এ পর্যন্ত কেহ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হন নাই। ইহাতে বৌদ্ধদের ও সমগ্র বঙ্গীয় ভিক্ষুদের উপকার সাধিত হইবে, সন্দেহ নাই।"...

ডাঃ শ্রীপতি রঞ্জন বড়ুয়া

রেঙ্গুন, বর্মা।

১২/১২/৬৩ইং

সংঘরাজ নিকায়ের শতবর্ষ-পূর্তি উপলক্ষে স্মারক-গ্রন্থ

সদ্ধর্মের পুনরুত্থান

রাজগুরু পণ্ডিত শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির, তত্ত্বভূষণ, বহুশ্রুত,
সূত্র-বিনয়-অভিধর্ম-বিশারদ, মৈত্রী প্রদীপ কর্তৃক সংকলিত

২৫০৮ বুদ্ধাব্দ, ১৩৭১ বঙ্গাব্দ

❖

২য় পুনঃ প্রকাশকাল

১৭ই মার্চ ২০১০ইং রোজ বুধবার
ঐতিহাসিক হাঞ্চারঘোনা পাষান সীমা প্রতিষ্ঠা
তথা উদ্বোধন অনুষ্ঠান

❖

প্রকাশক

বাবু পান্নালাল বড়ুয়া
বেতাগী, রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম।

❖

সার্বিক সহযোগিতায়

শ্রীমৎ নিরোধানন্দ ভিক্ষু
বেতাগী সার্বজনীন বৌদ্ধ বিহার, বেতাগী রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম।

❖

প্রাপ্তিস্থান

শ্রীমৎ ধর্মপ্রিয় মহাথের, মহানন্দ সংঘরাজ বিহার
মহামুনি, পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

❖

মূল্য ঃ ৫১ টাকা

উৎসর্গ

বাবু পান্নালাল বড়ুয়া'র পিতা-মাতার নিরোগ ও
দীর্ঘায়ু জীবন কামনায় এই গ্রন্থখানি
উৎসর্গ করিলাম।

- শ্রদ্ধেয় পিতা প্রিয়দা রঞ্জন বড়ুয়া
- শ্রদ্ধেয়া মাতা ঊষা রাণী বড়ুয়া

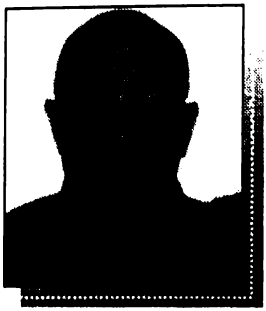

আশীর্বাণী

পন্ডিত রাজগুরু, মাননীয় ভারতীয় সংঘরাজ, মাননীয় ধর্মাধার মহাস্থবির কর্তৃক সংকলিত "সদ্ধর্মের পুনরুত্থান" বইটি ঐতিহাসিক তথ্য প্রদান ও চিন্তাশীল বৌদ্ধ জনগনের চাহিদা পূরণে সমর্থ হবে বলে আমার বিশ্বাস। ঐতিহাসিক ও স্মরণীয় ঘটনা সমূহকে উপলক্ষ করে সমাজের চিন্তাশীল দুরদর্শী বিদগ্ধ ও বর্ষীয়ান পন্ডিতবর্গের লেখনি সমৃদ্ধ পুস্তিকা প্রকাশ নিঃসন্দেহে একটি প্রশংসনীয় শুভ উদ্যোগ। এই শুভ উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই। ঐতিহাসিক তথ্য সমৃদ্ধ পুস্তক হলো বর্তমান ও ভাবী প্রজন্মের দুর্লভ সেতুবন্ধন। অতীতের গৌরবদীপ্ত বিজয়গাথা বর্তমানের সাধু সঞ্জীবনী কর্মধারায় গড়ে উঠে ভাবী প্রজন্মের দুর্লভ আশ্রয়স্থল। "স্বদ্ধর্মের পুনরুত্থান"বইটির মাধ্যমে একালের সাথে গৌরবদীপ্ত সেতুবন্ধন রচিত হোক, এই আশাবাদ ব্যক্ত করি।

পরিশেষে এই বই পুনঃ প্রকাশের উদ্যোক্তা বিচিত্র ধর্মকথিক, পন্ডিত ধর্মপ্রিয় মহাথের সহ প্রকাশক বাবু পান্নালাল বড়ুয়ার নিরোগ ও দীর্ঘায়ু জীবন কামনা করছি এবং বইটির বহুল প্রচার হোক, এই কামনা করছি।

আশীর্বাদক

সংঘরাজ ডঃ ধর্মসেন মহাস্থবির

অগ্‌গমহাসদ্ধর্মজ্যোতিকাধ্বজ,

ত্রিপিটক সাহিত্য চক্রবর্তী

উনাইনপুরা লঙ্কারাম বিহার।

আশীর্বাণী

বর্তমান সমাজ আঙ্গিকে বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস ও তথ্য নির্ভর পুস্তিকা "সদ্ধর্মের পুনরুত্থান" পূজনীয় ধর্মাধার মহাস্থবির কর্তৃক সংকলিত বইটি অমূল্য রত্ন সদৃশ্য এবং পাঠক সমাজে যথেষ্ট সমাদৃত। কিন্তু পূনঃপ্রকাশের অভাবে বইখানা সংগ্রহ করা বড়ই দুরূহ হয়ে উঠেছে। এহেন সময়ে অমূল্য রত্ন সদৃশ্য বইটি পুণঃমুদ্রন করে পাঠক সমাজে বিতরন করা একান্ত প্রয়োজন। পাহাড়তলী মহানন্দ সংঘরাজ বিহারের অধ্যক্ষ বিচিত্র ধর্মকথিক ধর্মপ্রিয় মহাথের এর অনুপ্রেরণায়, দানবীর সমাজসেবক, বাবু পান্নালাল বড়ুয়ার অর্থানুকুল্যে "সদ্ধর্মের পুনরুত্থান" বইটি পুণঃপ্রকাশ হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দ অনুভব করছি।

পরিশেষে বইটির বহুল প্রচার ও প্রকাশক বাবু পান্নালাল বড়ুয়ার সুদীর্ঘ দীর্ঘায়ু জীবন কামনা করছি।

আশীর্বাদক
শাসন শোভন
উপ-সংঘরাজ ডঃ জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির
নন্দনকানন বৌদ্ধ বিহার, চট্টগ্রাম।

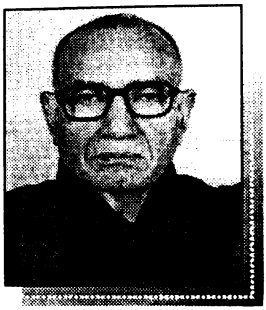

আশীর্বাণী

থেরবাদ আদর্শে বাংলাদেশে বৌদ্ধ ধর্ম পুনঃ জাগরনের ঐতিহাসিক তথ্য সমৃদ্ধ পুস্তক বর্তমান সময়ে বিলুপ্তপ্রায়। সময়ের বিবর্তনে অতীতের তথ্য সমৃদ্ধ পুস্তকগুলি পুনঃপ্রকাশ করে ভিক্ষুসংঘ তথা দায়ক-দায়িকার হস্তগত করা একান্ত প্রয়োজন। বহুগুনের অধিকারী, রাজগুরু, পন্ডিত, ভারতীয় মহামান্য সংঘরাজ ধর্মাধার মহাস্থবির কর্তৃক সংকলিত "সদ্ধর্মের পুররুত্থান" বইখানি বহু প্রয়োজনীয় তথ্যপূর্ণ ও বড়ই কৌতুহল উদ্দীপক। ২৫/০৮/১৯৬৪ ইংরেজীতে উক্ত বইখানি প্রকাশিত হলে ইহা পাঠক সমাজে যথেষ্ট সমাদর লাভ করতে সক্ষম হয়। বিগত কয়েক বছরে সদ্ধর্ম অনুরাগী পাঠক সমাজে গ্রন্থটি পাওয়ার যে বিপুল চাহিদা লক্ষ্য করেছি তারই নিরিখে বইটি পুনঃমুদ্রনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছি। গ্রন্থখানির ব্যাপক চাহিদা এবং সমাদর থাকলেও নানাবিধ কারণে এতদিন তা পুনঃপ্রকাশ করা সম্ভব হয়নি। আমার অত্যন্ত স্নেহভাজন আয়ুস্মান নিরোধানন্দ ভিক্ষুর সার্বিক কর্মপ্রচেষ্টায় দানবীর সমাজসেবক, বেতাগীর জন্মজাত, ত্রিরত্নের উপাসক, বাবু পান্নালাল বড়ুয়া বইটির পুনঃ প্রকাশের যাবতীয় ব্যয়ভার গ্রহণ করেছেন। এছাড়া তিনি বইয়ের যাবতীয় কাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন করে অতুলনীয় পূণ্যের ভাগী হয়েছেন। আমি আনন্দ চিত্তে ত্রিরত্ন সমীপে প্রকাশক বাবু পান্নালাল বড়ুয়ার পরিবারের সকলের সুখ-সমৃদ্ধিময় দীর্ঘায়ু কামনা করছি।

পরিশেষে এই বই পুনঃ মুদ্রণে, আর্থিক, কায়িক, বাচনিক সহযোগিতাকারীদের নির্বাণ লাভের হেতু হোক, এই আশীর্বাদ সহ বইয়ের বহুল প্রচার কামনা করছি।

আশীর্বাদক

বিচিত্র ধর্মকথিক ধর্মপ্রিয় মহাথের

মহানন্দ সংঘরাজ বিহার,

মহামুনি পাহাড়তলী, চট্টগ্রাম।

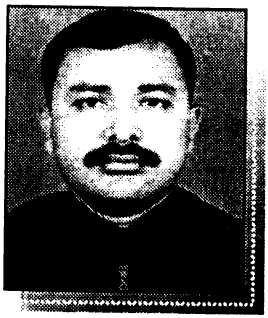

প্রকাশকের কিছু কথা

পরম পূজনীয় সংঘ মনীষা, ভারতীয় সংঘরাজ, রাজগুরু, পন্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের লেখনি সমৃদ্ধ ঐতিহাসিক তথ্য নির্ভর পুস্তিকা বর্তমান বৌদ্ধ সমাজ গগনে বড়ই দুর্লভ। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার কারনে প্রচুর চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বহুদিন যাবত এই গ্রন্থখানির পুনঃসংস্করণ সম্ভব হয়নি। ১৭ই মার্চ ২০১০ইংরেজী রোজ বুধবার অনুষ্ঠিত ঐতিহাসিক হাঞ্চারঘোনা পাষাণ সীমা প্রতিষ্ঠা তথা উদ্বোধন উপলক্ষে গ্রন্থখানির প্রয়োজনীয়তা ও দুষ্প্রাপ্যতার উপলব্ধি থেকে এবং পরম কল্যাণ মিত্র পূজণীয় বিচিত্র ধর্মকথিক ধর্মপ্রিয় মহাথেরোর নির্দেশে পরম শ্রদ্ধেয় নিরোধানন্দ ভিক্ষুর সানন্দ উৎসাহে অনুপ্রাণিত হয়ে "সদ্ধর্মের পুনরুত্থান" বইটি পুনঃ প্রকাশের দুর্লভ সুযোগ লাভে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি এবং এই দুর্লভ সুযোগ দানের জন্য ভান্তের কাছে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

পরিশেষে এ অমূল্য গ্রন্থখানি প্রকাশে যারা অকৃত্রিম সহযোগিতা করেছেন তাঁদের প্রতি আমার মৈত্রীময় শুভেচ্ছা ও কৃতজ্ঞতা রইল। মৈত্রীপূর্ণ সহাবস্থানে বিশ্বের সকল প্রাণী সুখী হউক।

পান্নালাল বড়ুয়া
বেতাগী,রাঙ্গুনীয়া
চট্টগ্রাম।

পূর্বাভাস

'সদ্ধর্মের পুনরুত্থান' প্রকাশিত হইল। আমরা ঐতিহাসিক নহি– ঔৎসক্য নিবারণকল্পে যাহা সন্ধান করিয়াছি, তাহার ফল উপস্থাপিত হইল। বৌদ্ধধর্ম প্রথমে থেরবাদ ছিল। ক্রমশঃ উহা পরিবর্তিত হইয়া তান্ত্রিক-ধর্মে পরিণত হয়। রাষ্ট্র-বিপ্লবে বৌদ্ধ-বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থরাজি ও ধর্মাচার্যগণ বিনষ্ট হইলে অনেক স্থলে মনগড়া ধর্ম বুদ্ধের নামে চলিতে থাকে। শেষের দিকে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে ধর্মজ্ঞানহীন রাউলী সম্প্রদায়ের হাতে এই ধর্মের চরম পরিণতি ঘটে। এই রাউলী সম্প্রদায় যে বংশপরম্পরা বৌদ্ধ সমাজের পুরোহিত ছিলেন তাহা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে দেখা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আকিয়াবের সংঘরাজ সারমেধ এই রাউলী সম্প্রদায়ের সান্নিধ্যে আসেন। তিনি শ্রদ্ধেয় রাধু মা থেকে 'বড়ুয়ারাউলী' ও শ্রদ্ধেয় জ্ঞানালঙ্কার প্রভৃতিকে থেরবাদ উপসম্পদা গ্রহণের পূর্বে মহাযানী পুরোহিত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। থেরবাদী ভিক্ষুর অনুকরণ করিলেও মূলতঃ তাঁহারা মহাযানী ছিলেন। সংঘরাজ সারমেধই তাঁহাদের মধ্যে সর্বপ্রথম সামগ্রিকভাবে থেরবাদ উপসম্পদা প্রবর্তন করেন।

সংঘরাজ সারমেধ-এর সংক্ষিপ্ত জীবনী এখানে সন্নিবেশিত হইল। 'প্রজ্ঞালোক জয়ন্তী' উপলক্ষে ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আমি আকিয়াব গিয়াছিলাম। বৌদ্ধ মিশন প্রেসের বিবাদ-মীমাংসার বিষয়ে একদিন তথাকার সংঘরাজ বিহারে আচার্য উঃ সুন্দর মহাথেরের সহিত সাক্ষাৎ করি। তাঁহার নিকট পরলোকগত সংঘরাজের জীবনী জানিবার প্রার্থনা জানাই। তিনি একটি বাঁধানো বই-এর শেষের দিক হইতে সংঘরাজের স্বহস্তে লিখিত আরাকানি ভাষায় জীবনী পাঠ করিয়া আমাকে শোনান। সুযোগমত উহা লিখিয়া আনিবার কথা হইল। ইতিমধ্যে আমরা পাথরকিল্লা মহামুনি, কেয়ক্ত, কাইন্‌জক, পোক্ত, মিনবিয়া প্রভৃতি ভ্রমণ করি। মাসাধিককাল পরে আকিয়াব ফিরিয়া আসিয়া পত্র পাইলাম বিনাজুরীতে আমার গুরুদেব সাংঘাতিক অসুস্থ। আর বিলম্ব না করিয়া অল্পক্ষণের মধ্যে চট্টগ্রামভিমুখী স্টীমারে আরোহণ করিলাম। সংঘরাজের জীবনী আনয়ন আর সম্ভব হইল না।

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের পুনরুজ্জীবনের নিমিত্ত যাঁহারা আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন–

সমাজ-সংস্কার, ধর্ম-প্রচার, অধ্যাপনা, গ্রন্থ প্রকাশ প্রভৃতি দ্বারা বৌদ্ধসমাজকে উন্নতির পথে অগ্রসর করিয়াছেন, তাঁহাদের জীবনী-সংগ্রহ প্রকাশ করিবার জন্য ভিক্ষু মহাসভায় এক প্রস্তাব গৃহীত হয়। তদনুসারে বহু মহাস্থবিরের জীবনালেখ্য সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু যিনি এই নিকায়ের শীর্ষস্থানে আছেন– সেই সংঘরাজের জীবনীর অভাবে সেই কার্য স্থগিত থাকে। কয়েকখানি ফটো সহ সংগহীত জীবনীগুলি শ্রদ্ধেয় অগ্রমহাপন্ডিত শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের নিকট রেঙ্গুনে জমা থাকে।

১৯৬৩ ইংরেজীতে সংঘরাজ সারমেধের জীবনী রেঙ্গুন হইতে তিন ভাষায় প্রকাশিত হয়। শ্রদ্ধেয় অগ্রমহাপন্ডিতের সৌজন্যে আমরা উহার এক কপি লাভ করি। তখন সঙ্কল্প হইল যে– সংঘরাজ নিকায়ের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে 'স্মারকগ্রন্থ'-রূপে জীবনীসংগ্রহখানি সম্পাদিত ও প্রকাশিত হউক। তজ্জন্য অগ্রমহাপণ্ডিত মহোদয়কে জীবনীর পান্ডুলিপির ফাইলটা পাঠাইবার অনুরোধ করি। দুর্ভাগ্যবশতঃ তাহা তিনি খুঁজিয়া পাইতেছেন না। সেই আশা আপাততঃ অপূর্ণ রহিল। জীবনীগুলি পুনরায় সংগ্রহের জন্য ভিক্ষু মহাসভার প্রতি আমাদের অনুরোধ রহিল। এ বিষয়ে আত্মনিয়োগ করিবার জন্য শিক্ষিত তরুণদিগকে আহ্বান জানাই।

সংঘরাজ সারমেধার জীবনী হইতে আমরা ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলার বৌদ্ধদের অবস্থা জানিতে পারি। এই পুস্তিকা প্রেসে দিবার পর সংঘরাজের মূলজীবনী হারাইয়া যায়। সেই কারণে তাঁহার প্রাপ্ত রাজকীয় উপাধির সীলমোহর তিনটি ব্লক করিয়া জীবনচরিত্রের যথাস্থানে দিতে পারি নাই। তজ্জন্য আমরা অনুতপ্ত। আর একটা জীবনীর জন্য রেঙ্গুনে লেখা হয়। শ্রদ্ধাবান উপাসক ডাঃ শ্রীসুধাংশু বিমল বড়ুয়ার বদান্যতায় তাহা পাইয়াছি। তখন জীবনী অংশ মুদ্রিত হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সীল-মোহরগুলি পূর্বাভাসের পার্শ্বে সন্নিবেশিত হইল। এতদ্বারা প্রমাণিত হইবে যে, তদানীন্তন ভারতগভর্নমেন্ট, পূণ্যশীলা কালিন্দী রাণী ও স্বাধীন ব্রহ্মরাজ মিনডন-মিন কর্তৃক তাঁহার মহিমান্বিত-জীবন স্বীকৃত ও সম্মানিত হইয়াছিল। এইরূপ গৌরবার্জন বৌদ্ধ-থেরদের মধ্যে আর কাহারো জীবনে ঘটে নাই।

এই সঙ্গে ভিক্ষু-সংঘকে আবার অনুরোধ করি, বৌদ্ধদের মধ্যে প্রচলিত গোষ্ঠীর বিবরণ কিংবদন্তী সহ তাঁহারা যেন সংগ্রহ করেন। তাহাতে সমাজের ঐতিহাসিক বহু মূল্যবান উপাদান সংগৃহীত হইবার সম্ভাবনা আছে। ইতিহাসে সম্বন্ধে

বাংলার বৌদ্ধেরা এত উদাসীন যে, মৃত্যুর পর লোকের কোষ্ঠিখানাও তীর্থস্থানে উড়াইয়া দেওয়া হয়, ফলে তিন পুরুষের নাম জানা থাকে না। এ বিষয়ে চাক্‌মা সমাজ অপেক্ষাকৃত সজাগ।

ভৌগোলিক সংজ্ঞায় ভারতবাসী মাত্রেই হিন্দু। আচার্য ব্রহ্মবান্ধব নিজকে ঈশাই-পন্থী হিন্দু বলিতেন। সেই হিসাবে ভারতীয় মুসলমানেরাও অহিন্দু নহেন। হিন্দু মহাসভা ভারতীয় ধর্মের অনুগামী ভারতবাসী মাত্রকেই হিন্দু আখ্যা দিয়ে থাকে। তদনুসারে জৈন, শিখ প্রভৃতির ন্যায় বৌদ্ধেরাও হিন্দু। এই যুক্তিতে পূজনীয় ভিক্ষু উ: উত্তম হিন্দু মহাসভার সভাপতি হইয়াছিলেন। ভারতীয় বৌদ্ধেরা বৌদ্ধরাজত্বের পরথ– মুসলমান ও খৃষ্টান রাজত্বের সময়ে- এমন কি স্বাধীনতা উত্তর কালেও দায়ভাগ আদিতে হিন্দু-আইন অনুসারেই চলিতেছেন। সুতরাং বৌদ্ধকে হিন্দু বলিলে অন্যায় হয় না। মুকুট রায় সংস্কৃতিগত বৌদ্ধ ও দেশবাসী হিসাবে হিন্দু ছিলেন।

চাক্‌মা-জাতির সহিত বড়ুয়া-জাতির সম্পর্ক চিরকালের। উভয় জাতি একই ধর্ম-সংস্কৃতির উত্তর সাধক। যুগ যুগ ধরিয়া তাঁহারা পাশাপাশি বাস করিতেছেন। পরস্পরের মধ্যে বিবাহসম্পর্ক ঘটিয়াছে। বড়ুয়া গোছার অনেক লোক চাক্‌মা জাতিতে পরিণত হইয়াছে। পার্বত্য চট্টগ্রামের পুলিশ সাব ইন্সপেক্টার শ্রী নিবারণ চন্দ্র দেওয়ান, রাঙামাটী হাসপাতালের তদানীন্তন হেডক্লার্ক বিনোদলাল চাক্‌মা, আমীন শ্রী বিমল চন্দ্র চাক্‌মা প্রভৃতি বড়ুয়া বংশের লোক। এই বংশের পাঁচজন রাজারাণী চাক্‌মা রাজ্যে রাজত্ব করিয়াছেন। সেইরূপ বড়ুয়াদের মধ্যে চাক্‌মা জাতির অংশবিশেষ মিশিয়া গিয়াছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বতন্ত্র জেলা ও সংরক্ষিত অঞ্চল হওয়ার পর ভৌগোলিক দূরত্বের দরুণ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইলেও সুখের বিষয় বর্তমানে তাঁহাদের সম্পর্ক আবার ঘনিষ্টতর হইতেছে।

কিছুদিন হইতে দেখা যায়, নানা দিক হইতে আমরা অনর্থক আক্রান্ত হইতেছি। পূর্ববর্তী অনেক মহিমান্বিত মহাপুরুষের জীবন এইরূপ সংঘর্ষে পড়িতে দেখিয়াছি। কিন্তু আমার মধ্যে তাঁহাদের ন্যায় যোগ্যতা ও মহত্ব কিছুই নাই। তথাপি এই অসূয়ার লক্ষ্য কেন হইলাম, জানি না। আমাদের বিদ্যাবুদ্ধি কিংবা আত্মীয়-স্বজনের বল তেমন নাই। সেই কারণে বাহুবলকে উদ্দেশ্যসিদ্ধির উপায়রূপে আমরা কখনও অবলম্বন করি নাই। সর্বদা ন্যায় ও সত্যপথে থাকিয়া জীবন যাপনের প্রয়াস করিয়াছি। ন্যায় ও সত্যের জন্য সংগ্রামে আমরা কখনও কুণ্ঠিত নহি। বোধিসত্ত্বের এক বীর্যপূর্ণ বাণী হইতে এ বিষয়ের প্রেরণা

পাওয়া যায়ঃ "সংগামে মে মতং সেয়্যো যঞ্চ জীবে পরাজিত্যে" অর্থাৎ সংগ্রামে পরাজিত হইয়া বাঁচিয়া থাকা অপেক্ষা যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত্যুবরণই আমার শ্রেয়ঃ। ন্যায় ও সত্যপথে থাকিয়া অকৃতকার্য হইলেও তাহাতে সান্ত্বনা আছে।

উপাসক শ্রীউমেশচন্দ্র মুচ্ছদ্দীকে সমাজের একজন ক্ষণজন্মা পুরুষ বলিতে হইবে। একজীবনে নিজের ও সমাজের জন্য তিনি যাহা করিয়াছেন অন্যত্র তাহা বিরল। তথাপি সর্ব বিষয়ের সমাধান তাঁহার ধারা হইবে এই প্রত্যাশা দুরাশা মাত্র। তাঁহার ক্ষেত্রে তিনি কৃতী। তাঁহার কোন কর্মশক্তিতে আস্থা ছিল বলিয়াই এক সময় সহকর্মীও ছিলাম। কিন্তু ভিক্ষুর বিনয় সম্বন্ধে তাঁহার বিচার মানিয়া লইতে হইবে, তজ্জন্য কাহাকেও বাধ্য করা চলে না।

আমার অনুদিত 'শাসন-বংশ'-এর মুখবন্ধে "১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে (১২২৬ মগাব্দ) সংঘরাজ সশিষ্য আগমন করেন এবং প্রথমেই একদিনে জ্ঞানালঙ্কার প্রমুখ সাতজনকে উপসম্পদা প্রদান করেন। কিন্তু কতিপয় মহাস্থবির মর্যাদা হানির ভয়ে উৎসবে যোগদান করিলেন না।" ...এই কারণেই দেশে দুই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এই সত্য উক্তির জন্য মুচ্ছদ্দীবাবু ভিক্ষুদের মিলনের অসাফল্যকামী বলিয়া আমার বিরুদ্ধে আক্রমণমূলক 'নিবেদন' প্রচার করিলেন। যথা সময় আমরা উহার জবাব দিয়াছি। তদুত্তরে তিনি 'পাকিস্তানী ভিক্ষুগণের মিলনে আমার শেষ বক্তব্য' বনাম 'মাননীয় শ্রীমৎ ধর্মাধার মহাস্থবির কর্তৃক প্রচারিত পুস্তিকা সম্বন্ধে আমার মন্তব্য' নামক বই প্রচার করেন। উহা আমরা ১৭/১/৬৪ ইং তারিখে প্রাপ্ত হই। এই পুস্তিকার তৎসম্বন্ধে কিছু আলোচনা আছে।'

শ্রদ্ধেয় সংঘরাজের সশিষ্যে আগমন, বার বার আগমন ও রাজানগর সীমা-স্থাপনে আগমনের বিষয় শুনিলে মুচ্ছদ্দীবাবুর হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। তিনি ধৈর্যহারা হইয়া পড়েন। সংঘরাজের সশিষ্যে আগমন স্বীকৃত হইলে তদানীন্ত ন 'বড়ুয়া রাউলী' দিগকে থেরবাদ উপসম্পদায় গণপূরক লইবার কল্পনা ধুলিস্যাৎ হয়। বার বার আগমন রোধ করিবার জন্যই মুচ্ছদ্দীবাবু রাজানগর সীমা প্রতিষ্ঠায়– তিন বৎসর পূর্বে মৃত- মান্দালায়-এর সংঘরাজকে হাজির করিবার অপপ্রয়াস পাইয়াছেন। সংঘরাজের জীবনী আলোচনা করিলে তাঁহার এবং আমাদের অনেক ভুল সংশোধিত হইবে।

মুচ্ছদ্দীবাবু সব সময় সন্তর্পণে একটা মৌলিক প্রশ্ন পাশ কাটিয়া যাইতেছেন। চট্টগ্রামের এই তান্ত্রিক আচার্যগণ সংঘরাজ সারমেধ মহাথের আগমনের পূর্বে বা পরে কোন সময়, কোথায়, কাহার উপাধ্যায়ত্বে, কে কে থেরবাদ বিনয়সম্মত

উপসম্পদা গ্রহণ করিয়াছেন? উপসম্পদা দাতা ও গ্রহীতার পক্ষে তৎসম্বন্ধে স্বীকৃতির কি নিদর্শন আছে? সংঘরাজ নিকায়ের ভিক্ষুদের উক্তি যে, তাঁহারা পূর্বে তান্ত্রিক রাউলী ছিলেন, থেরবাদ ভিক্ষুদের অনুকরণ করিয়াছেন। থেরবাদ বিনয় না জানায় উপসম্পদার বয়স বিবেচনা করিতেন না। উপসম্পদার পর উপসম্পন্নকে দশ-শীল দিতেন। আচার্য ক্ষেত্রমোহন ভিক্ষু আরাকান হইতে উপসম্পদা গ্রহণ করায় তাঁহাদের সহিত ধর্মামিষ সম্ভোগ করেন নাই। স্বতন্ত্র দল করিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় চন্দ্রমোহন ভিক্ষু তথাকথিত উপসম্পদার প্রায় সাত বৎসর পরে পল সাহেবের সৌজন্যে ভুল বুঝিতে পারেন এবং আকিয়াবে গিয়া পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করিয়াছেন। এই সকল দৃষ্টান্ত হইতে নিজেদের ভুল বুঝিতে পারিয়া তাঁহারা সমগ্রভাবে থেরবাদী উপসম্পদা গ্রহণের নিমিত্ত ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে, (১২২৬ মগাব্দ) শ্রদ্ধেয় সংঘরাজ সারমেধ মহাথেরকে আহবান করেন এবং সকলে থেরবাদ উপসম্পদা গ্রহণ করেন। যাঁহারা উপসম্পদা গ্রহণ করিলেন তাঁহারা সংঘরাজ নিকায়-এ পরিণত হইলেন। আর যাঁহারা উপসম্পদা গ্রহণ করিলেন না তাঁহারা মাথের নিকায়-এ রহিলেন। ইহাতেই বৌদ্ধ আচার্যগণ মহাযান ও থেরবাদী হিসাবে দ্বিধা বিভক্ত হইল। মুচ্ছদ্দীবাবু মাথের নিকায়ের ভিক্ষুদের থেরবাদ উপসম্পদা গ্রহণের প্রমাণ সোজাসোজি উপস্থাপিত না করিয়া শুধু বলেন: "সংঘরাজ অন্তত: চারিজন গণপূরক লইয়া থাকিবেন, দীপঙ্কর-শীলভদ্র, গুণামেজু কি উপসম্পদার বয়স জানিতেন না? আচারিয়া যাহাদিগকে স্বীকার করিয়াছেন বাড়িওয়ালার ছাদে ভিক্ষুরা যাহাদের সঙ্গে খাইয়াছেন, ধর্মাধার ভন্তে মধ্যমনিকায়ে লিখিয়াছেন"– এই সব অবান্তর যুক্তি দিয়া মৌলিক উপসম্পদাগ্রহণকে ধামাচাপা দিতেছেন। এই ওকালতি তর্কে কি বিনয় সম্মত থেরবাদ উপসম্পদা প্রতিষ্ঠিত হইবে?

বাংলাদেশের ভিক্ষুদের মিলনের প্রয়োজনীয়তা হৃদয়ঙ্গম করিয়াই আমরা তজ্জন্য বহু গবেষণা করিয়াছি। আমাদের উপলব্ধ সিদ্ধান্ত সমাজের সামনে উপস্থাপিত হইয়াছে। দল্‌লী কর্ম বা পুনঃশিক্ষা কর্মবাক্যদ্বারা প্রকৃত মিলন সম্ভব। এই সিদ্ধান্তের ক্রটি প্রদর্শনের নিমিত্ত শুধু বাংলার নহে– সমগ্র থেরবাদ দেশের বিনয়ধরদিগকে সাদরে আহবান জানাইতে পারি। এতদপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপায় যদি কেহ প্রদর্শন করেন তবে তাঁহার নিকট আত্মসমর্পণ করিতে আমরা প্রস্তুত। ইহাতেও যদি সমাজের কপট নিদ্রা না ভাঙ্গে, সমাজের অংশ বিশেষ অতীতের ভুলকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকেন, তবে আর উপায় কি? আমাদের বক্তব্য

বলিয়া যাইতেই হইবে। বিশ্ব কবির ভাষায়ঃ "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে, তবে একলা চলরে!" অধিমাস বিনিশ্চয়-এর ন্যায় ভিক্ষুদের মিলন ব্যাপারে ইহাই আমাদের শেষ নিবেদন হউক।

মহাযান অধ্যুষিত তিব্বত প্রভৃতি দেশে লামারা একাধারে ধর্মগুরু ও রাষ্ট্র-শাসক। আমাদের দেশে মহাযানী মাথেগণ এক সময় বৌদ্ধসমাজের ধর্ম ও শাসনকার্য পরিচালনা করিয়াছেন। তাঁহারা রাজার হালে চলিতেন। থেরবাদ উপসম্পদা গ্রহণের পর তাঁহারা শাসনকার্য পরিত্যাগ করিলেন। ইহার প্রতিক্রিয়া দেখা দিল যে, ভিক্ষুরা সর্বক্ষেত্রে উৎখাত হইতে লাগিলেন। দায়কের বিনা নিমন্ত্রণে তাঁহাদের নিদ্রাগমনও যেন অনুচিত! ভিক্ষু ও দায়কের মধ্যে কত মধুর সম্পর্ক রহিয়াছে সিংহল, বার্মা, শ্যাম, কাম্বোডিয়া ইহার উজ্জ্বল নিদর্শন। গৃহীরা ভিক্ষুদের সর্ববিধ স্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা করিবেন কিন্তু কখনও তাঁহাদের অধিকারে হস্তক্ষেপ করিবেন না। বিনয় বিধান ও সহস্র সহস্র বৎসরের আচরণ অমান্য করিয়া ভিক্ষু ও গৃহীদের প্রতিদ্বন্দ্বীতায় এই দেশের বুদ্ধ-শাসন অন্ত র্ধানের পথে চলিয়াছে। পরস্পরের স্বার্থ ও স্বাধিকার সম্বন্ধে সচেতন থাকিলে এই বিপর্যয় ঘটিতনা। তজ্জন্য এখানে বিহারের সহিত ভিক্ষু ও গৃহীর সম্পর্কের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। গৃহীরা চর্তুপ্রত্যয়ের দাতা মাত্র।

এই 'পূর্বাভাস' মুদ্রণের সময় (৯/১০/৬৪ ইং) মুচ্ছদ্দী বাবুর স্থানীয় এজেন্টদের মারফত তাঁহার শেষ বক্তব্যের সংক্ষিপ্তসার পরিশেষ বক্তব্য রূপে 'বৃদ্ধের মুমুর্ষু বচন' পাওয়া গেল। অতঃপর অবশেষ ও সর্বশেষ বক্তব্যের অপেক্ষায় রহিলাম। 'সদ্ধর্মের পুনরুত্থান' প্রকাশের খবরে অধীর হইয়াই তিনি সহসা ইহা প্রচার করিয়াছেন– যাহাতে আমাদের বক্তব্য সত্যরূপে গৃহীত না হয়। সমাজের উদীয়মান যুবক-যুবতী, বৃদ্ধা-বৃদ্ধা ও ভিক্ষুসংঘের প্রত্যেকে স্বীয় বিবেকের কষ্টিপাথরে যাচাই করিয়াই প্রকৃত তথ্য গ্রহণ করিবেন। তজ্জন্য আশঙ্কা ও আসফালনের কি আছে? মুমুর্ষু বচনের উত্তর এই বই-এ ইতস্তত: রহিয়াছে। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে রাজানগর সীমা প্রতিষ্ঠায় শ্রদ্ধেয় রাজগুরু ভগবান চন্দ্র মহাস্থবিরকে 'চাক্ষুষ সাক্ষী' রূপে মুচ্ছদ্দীবাবু উপস্থিত করিয়াছেন। অথচ তখন রাজগুরু পাঁচ বছরের শিশু। মুচ্ছদ্দী বাবু সেই সীমা বন্ধনে শ্রদ্ধেয় গুণামেজুর গুরু উপস্থিত সংঘরাজকে তিনবৎসর পূর্বে লোকান্তরিত মান্দালয়-এর সংঘরাজ বলিয়া ১২৭০ সালের মধ্যভাগে উৎপন্ন এই শিশু দ্বারা সাক্ষ্য দান করাইবেন! চমৎকার ওকালতি! পণ্ডিত প্রজ্ঞানন্দ ভন্তে বলেনঃ "মহীয়সী রাণী কালিন্দীর

বদান্যতায় সংঘরাজ সারমিত্র রাজানগরে 'সুমঙ্গল রত্ন সীমা' প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার পূর্বে চট্টগ্রামে প্রকৃত কোন ভিক্ষু-সীমা ছিল না। সারমিত্র ব্রহ্মদেশ হইতে বহু বিনয়ধর ভিক্ষু আনিয়াছিলেন।" [-আবোল-তাবোল, ৭ পৃঃ] এই উক্তি সংঘরাজের জীবনী সমর্থন করে।

সংঘরাজ সারমেধ প্রথমবার চট্টগ্রাম আসিয়া কাহাকেও উপসম্পদা দেন নাই। প্রজ্ঞানন্দ ভন্তের এই উক্তি সত্য। সংঘরাজের জীবনী তাহার প্রমাণ। তথাপি এই বিষয়ে 'আবোল-তাবোল' অপেক্ষা জীবনীর সন-তারিখই প্রামাণ্য।

মুচ্ছদ্দীবাবু বলেন ফৌজদারী কোর্টে সাক্ষ্য দেওয়া 'ভিক্ষুধর্ম ও ট্রেডিশনের বিপরীত'। কোন আবাসিক ভিক্ষু বাহির হইতে আসিয়া বিহারের ভিজিটর বই-এ স্বাক্ষর করে নাই বলে রাত্রি প্রায় সাড়ে দশটায় চার, পাঁচজনে নিষ্ঠুর আক্রমণ করিয়া তাহার শরীরের আট স্থানে ক্ষত-বিক্ষত করিয়াছে, রক্তপাত করিয়া স্বাক্ষর করিতে বাধ্য করিয়াছে। দুইটি দাঁত তুলিয়া ফেলিতে হইয়াছে। আপোষের আশায় সভাপতির দৃষ্টি আকর্ষিত হইয়াছিল। 'এই সব নোংড়ামিতে আমি নাই' বলিয়া তিনি উঠিয়া গেলেন। আপোষ না হওয়ায় অগত্যা অষ্টমদিনে ন্যায়ালয়ের আশ্রয় লইতে হয়। ম্যাজিস্ট্রেট ক্ষতস্থান সমূহ দেখিয়াই সঙ্গে সঙ্গে আসামীদিগকে তলব করিয়াছেন। মুচ্ছদ্দীবাবু তাই গৃহীত কার্যকে 'ভিক্ষু ধর্ম ও ট্রেডিশনের বিপরীত' মনে করেন না। সত্য সাক্ষ্য প্রমাণে আসামীরা দণ্ডিত হওয়ায় সাক্ষীর প্রতি তাঁহার বিষদৃষ্টি। সেই সাক্ষীর 'প্রদত্ত তথ্য সত্য' নহে, এই তাঁহার ওকালতি যুক্তি।

সিংহলের প্রধানমন্ত্রী পরলোকগত বন্দরনায়ক মৃত্যুর পূর্বে আততায়ীকে ক্ষমা করেন। সেই কারণে কি সোমারামের বিচার ও দণ্ড হয় নাই? শ্রীমতি বন্দরনায়ক প্রভৃতি প্রত্যক্ষ সাক্ষীর সাক্ষ্যে আসামীর দণ্ড হইল। তজ্জন্য তাঁহাদের প্রদত্ত তথ্য কি মিথ্যা হইবে? এই দলবদ্ধ নিষ্ঠুরতার প্রতি ঘৃণা ও নিন্দা করিবার সৎসাহস যাঁহাদের নাই, বরং প্রশ্রয় দিতে উন্মুখ; তাঁহাদের ওকালতি দৃষ্টিভঙ্গী সমাজ জীবনের নৈতিক শৃঙ্খলা বজায় রাখিবে কি? মৃত্যুর সময় ঘোষণাকারীর পক্ষে এই অপকর্মের পক্ষপাতিত্ব করা উচিত কিনা সুধীবৃন্দের বিবেচ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর কথা বাদ দিলেও বিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে 'অভিধানপ্পদীপিকা', 'রাহুলোবাদ'-এর গ্রন্থকার বক্তা জ্ঞানানন্দ স্বামী, সদ্ধর্ম বিশারদ আর্য্যালঙ্কার মহাস্থবির, বহুগ্রন্থ সম্পাদক শ্রী বিমলানন্দ মহাস্থবির, শ্রী মহেন্দ্রলাল মহাস্থবির, ধর্মালোক মহাস্থবির, দেবানন্দ স্থবির, শ্রী সত্যপ্রিয়

ভিক্ষু, শ্রদ্ধেয় শ্রী রমেশচন্দ্র মহাস্থবির, শ্রী ধর্মানন্দ স্থবির, শ্রী শীলানন্দ স্থবির, শ্রী জ্ঞানশ্রী ভিক্ষু প্রভৃতি যখনই থেরবাদ উপসম্পদা গ্রহণ করিয়াছেন। তখন তাঁহাদের সহিত মিলনে সংঘরাজ নিকায়ের কোন আপত্তি থাকে নাই। সংঘরাজ নিকায়ের ন্যূনতম দাবী থেরবাদ উপসম্পদা, উহা গৃহীত হইলেই মিলন হইবে। ভিক্ষুদের মিলনই আমাদের কাম্য। তজ্জন্য বৃহত্তর নিকায়ের প্রতিনিধিরূপে আমরা ক্ষুদ্রতর নিকায়ের প্রতিনিধি স্থানীয় শ্রী বিশুদ্ধানন্দদের নিকট মিলনের প্রস্তাব নিয়া বার বার উপস্থিত হইয়াছি। সমাজের ব্যাপক মঙ্গলের জন্য পূনরচনা করিতেও সঙ্কোচ মনে করি না।

পরমারাধ্য আচার্য্য পূর্ণাচার মহাথের, ধর্মকথিক ধর্মানন্দ মহাথের, অগ্রমহাপণ্ডিত শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাথের পণ্ডিত শ্রীমৎ বংশদীপ মহাথের, পণ্ডিত শ্রীমৎ জ্ঞানীশ্বর মহাথের, পণ্ডিত বিশুদ্ধানন্দ মহাথের প্রভৃতি নেতৃবৃন্দ ভিক্ষুদের মিলনে যেই উদ্যম করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছি। তাঁহাদের প্রচেষ্টা আমাদের গতিপথ সুগম করিয়াছে।

উভয় নিকায়ের ভিক্ষু সভায় 'কর্মবাক্য'-পাঠে মিলনের সিদ্ধান্ত হইয়াছে। তাঁহাদের পথে চলার সহায়তা করা মিলনকারীদের পক্ষে অপরিহার্য কর্তব্য। তাহা না করিয়া মুচ্ছদ্দীবাবু 'তৃণাচ্ছাদন কর্ম করিবার জন্য ব্যাকুল, ২। ৩ মাসের মধ্যে– তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে– উহার ব্যবস্থার আহবান জানাইয়াছেন। কান্ত কবির গানটা মনে পড়েঃ "বেলা যে ফুরিয়ে যায়, খেলা কি ভাঙে না হায়!!" আমাদের ধারণা 'সম্মুখ বিনয়ের' ন্যায় 'তৃণাচ্ছাদনের' মায়া ভ্যাগ করিতে পারিলে তিনি শান্তি পাইবেন। আমাদের পূণ্যপ্রভাবে তাঁহার শতায়ূ লাভ হউক!

উপসংহারে বক্তব্য যে, উমেশ বাবু দীর্ঘ লেখনীর মাধ্যমে আদর করিয়া আমাদিগকে অনেক সদুপদেশ দিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। কদাচিৎ তিনি ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া স্বীয় মহত্বতার পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহার কোন অপরাধ আমরা গ্রহণ করি নাই। বরঞ্চ এই আলোচনায় সত্যের দ্বার খুলিয়া যাইবে। তাঁহার প্রতি আমাদের অনুরোধ রহিল, এই শতাব্দী কালের সমস্যা সমাধানে বৃথা মান, অভিমান ত্যাগ করিয়া– উভয় ভিক্ষু মহাসভা যখন 'কর্মবাক্য' পাঠে মিলনে সম্মত আছেন তখন- সর্বশক্তি প্রয়োগে তিনি ইহাকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার প্রয়াস করুন। তাহাতেই তিনি ক্ষমার্হ ও গৌরবার্হ হইবেন।

যদিও বাদ-প্রতিবাদের মধ্যে 'আবোল-তাবোল', 'আমার মন্তব্য', 'মূলতত্ত্ব', 'নিবেদনের জবাব', 'শেষ বক্তব্য' ও বর্তমান বই বাহির হইয়াছে, তথাপি অনুসন্ধিৎসু পাঠক নীর ছাড়িয়া ক্ষীর গ্রহণ করিলে এইগুলি দ্বারা উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার বৌদ্ধদের প্রকৃত ধর্মীয় ইতিহাস সম্বন্ধে সঠিক সিদ্ধান্ত গঠন করিতে পারিবেন। এই পুস্তিকাগুলির মধ্যে একটা অদৃশ্য যোগ-সূত্র রহিয়াছে। পাঠকের পক্ষে প্রত্যেকটির জ্ঞান থাকা বাঞ্ছনীয়।

এই পুস্তিকা সংকলনে আমাদের তেমন কৃতিত্ব নাই। নানাগ্রন্থের সহায়তায় ইহা সংকলিত হইয়াছে। সেই সকল গ্রন্থকারের ঋণ এখানে স্বীকৃত হইল। ইহার সংকলনে অনেকের উৎসাহ ও সাহায্য পাইয়াছি। তাঁহাদের সকলের প্রতি আন্তরিক ধন্যবাদ রহিল।

২৫।৮।৬৪ ইং
১, বুড্ডিষ্ট টেম্পল স্ট্রীট,
কলিকাতা-১২

শ্রীধর্মাধার মহাস্থবির
অধ্যক্ষ
নালন্দা বিদ্যাভবন।

সংঘরাজের উপাধি সমূহ

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বৃটিশ সরকার কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি ও সীল-মোহর। (১১ পৃঃ)

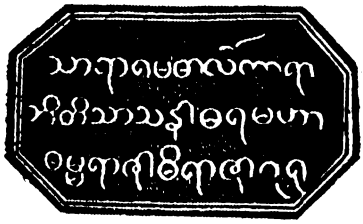

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে অধিরাণী কালিন্দীরাণী কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি ও সীল-মোহর। (১৩ পৃঃ)

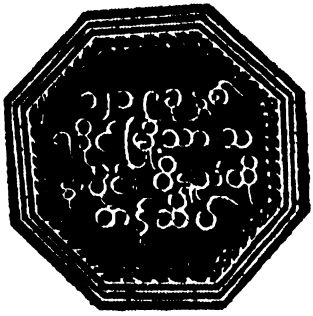

১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ মিন্‌ডন কর্তৃক প্রদত্ত উপাধি ও সীল-মোহর। (১৬ পৃঃ)

বিষয় সূচী

বিষয়	পৃষ্ঠা
১। ধর্মের পরিণতি	১
২। রাউলী পুরোহিত	৬
৩। সংঘরাজ সারমেধ	৭
৪। বৌদ্ধেরা কি অহিন্দু?	৮
৫। বড়ুয়া ও চাক্‌মা	৯
৬। চট্টগ্রামের ধর্ম	১০
৭। উপসম্পদার বয়স	১১
৮। শীলভদ্রের দোহাই	১২
৯। অপব্যাখ্যা	১৩
১০। পশ্চাদপসরণ	১৪
১১। ৩য় প্রশ্ন– 'ঠাকুর গড়ানি'	১৫
১২। চতুর্থ প্রশ্ন	১৬
১৩। পঞ্চম আলোচনা	১৭
১৪। অন্যান্য বিষয়	১৮
১৫। বিহারের মালিক ভিক্ষুসংঘ	১৯

ধর্মের পরিণতি

বুদ্ধের পরিনির্বাণের দুইমাস পরে রাজগৃহে অনুষ্ঠিত প্রথম সংগীতিতে ধর্ম-বিনয় ত্রিপিটক হিসাবে সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হয়। উহার একশ বৎসরের মধ্যে বর্জিপুত্র ভিক্ষুগণ দশটি বিবাদাস্পদ বিষয় সংঘের মধ্যে প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। উহার নিরসনকল্পে বৈশালীতে দ্বিতীয় সংগীতি অনুষ্ঠিত হয়। ইহার পরবর্তী একশ বিশ বৎসরের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম স্থবিরবাদ ও মহাসাংঘিক এই দুই ভাগে বিভক্ত হয়। রক্ষণশীল স্থবিরবাদীরা বুদ্ধকে মহামানব রূপে রাখিতে চাহেন। মহাসাংঘিকেরা বুদ্ধের মধ্যে অলৌকিক ও অমানরূপ আরোপ করিতে থাকেন। পরে উহারা অষ্টাদশ শাখা-প্রশাখায় পরিণত হয়। খৃষ্টপূর্ব ২৫৩ অব্দে সম্রাট অশোকের প্রেরণায় তৃতীয় সংগীতির অধিবেশন হয়। উহাতে স্থবিরবাদ মতই সর্বসম্মতভাবে বুদ্ধবাণীরূপে স্বীকৃত হয় এবং তাহা ভারতে ও বহির্ভারতে প্রচারের জন্য ধর্মদূত প্রেরিত হয়। মহাসাংঘিকেরা ইহাতে উপেক্ষিত হইলেও হাল ছাড়িলেন না। ইহার সাড়ে তিনশ বৎসর পর কুশানরাজ কণিষ্কের (৭৮ খৃষ্টাব্দে) সময় মহাসাংঘিকদের উদ্যোগে ভারতে চতুর্থ সংগীতির অধিবেশন হয়। এই সময় ত্রিপিটক সংস্কৃত ভাষায় পরিবর্তিত হয়। এই রূপান্তরিত মতের নাম হয় সর্বাস্তিবাদ। খৃষ্টীয় ৩য় শতাব্দী পর্যন্ত পূর্বের অষ্টাদশ শাখার জের চলিলেও মহাযান মত তখন ভিতরে ভিতরে অঙ্কুরিত হইতে থাকে। ক্রমে সংস্কৃত বৌদ্ধ-সাহিত্যের পণ্ডিতগণ সৌত্রান্তিক, বৈভাষিক, মাধ্যমিক ও গৃহাচার এই চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইলেন। সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধ-দর্শনের অনেক গ্রন্থ রচিত হইল। নাগার্জুন, দিঙ্‌নাগ, অসঙ্গ, ধর্মকীর্তি প্রভৃতি পণ্ডিতগণের প্রচেষ্টায় এই সকল উন্নত মতবাদ ভারতে ও বহির্ভারতে প্রচারিত হইতে থাকে। ইতিমধ্যে মাধ্যমিক ও যোগাচার সম্প্রদায় সম্মিলিতভাবে নিজেদের মহাযান নাম রাখেন এবং অপর দুই সম্প্রদায়কে হীনযান আখ্যা প্রদান করেন। খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত মহাযান সম্প্রদায় দার্শনিক চিন্তার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করেন। তৎপর উহার পতনের সূচনা হয়।

খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত উত্তর ভারতে বিশেষত বঙ্গদেশে– মহাযান হইতে বজ্রযান, সহজযান প্রভৃতি মতবাদের সৃষ্টি হয়। সঙ্গে সঙ্গে দেশের তান্ত্রিক-সাধনাও উহাতে সংযুক্ত হইয়া পড়ে। তদানীন্তন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে জটিল দর্শন ছাড়িয়া এই তন্ত্র ধর্মের চর্চা চলিল। পাল

রাজাদের সহায়তায় এই তান্ত্রিক-বৌদ্ধধর্ম তিব্বত, চীন, নেপাল, ব্রহ্ম, শ্যাম, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশে প্রচারিত হয়। এই সময় ভারতে চুরাশি সিদ্ধার- নাথ-গুরুদেব আবির্ভাব ঘটে। তাঁহাদের পরম্পরা এই সম্প্রসারণে অগ্রণী হইলেন। বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ দোঁহাবলী ও চর্যাপদ সাহিত্য রচিত হইতে থাকে। পাল রাজাদের পর সেনবংশের আমলে বাংলায় আবার ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রভাব বাড়িতে থাকে এবং জাতিভেদপ্রথা প্রচলিত হয়। অনেক বৌদ্ধতীর্থ-হিন্দুতীর্থে পরিণত হয়। তখন একটা সমন্বয়ের চেষ্টা চলিতে থাকে। হিন্দু-তন্ত্র ও বৌদ্ধ-তন্ত্র মিশ্রিত হইয়া ধর্মের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়ে। এই অবস্থা সম্বন্ধে কোন পণ্ডিত বলিয়াছেন:

'সুরাপান অত্যাচার ভ্রূণ-হত্যা ব্যভিচার,
তন্ত্র-ধর্মে ভারত ব্যাপিল।
যক্ষ রক্ষ বিষ হরি নানা উপহার করি
জীব সব পূজিতে লাগিল ॥'

– গৌড়পাদ তরঙ্গিনী, ১৪ পৃঃ

এই তান্ত্রিক-ধর্মই ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে ইসলাম অভিযানে বিধ্বস্ত হইতে থাকে। তান্ত্রিক অনাচার সেই ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করে।

এই সময় বৌদ্ধদের বড় বড় বিহারগুলি লুণ্ঠিত ও ভস্মীভূত হয়। ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীর পরও ধ্বংসলীলা চলিতে থাকে। এই সময় নালন্দা, ওদন্ত পুর, বিক্রমশীলা, সোমপুর, জগদ্দল, কণকস্তুপ ও পণ্ডিত বিহার প্রভৃতি ক্রমশ: ধ্বংসের কবলে পড়ে। ইহাতে অনেক বৌদ্ধ-আচার্য নিহত ও ইতস্তত: পলায়িত হন। তখনকার প্রধান কাশ্মীরী পণ্ডিত শাক্যশ্রী ভদ্র বিক্রমশীলা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হইবার পর পলায়ন করিয়া পূর্ববঙ্গের 'জগদ্দল বিহার-এ' আশ্রয় লইলেন। যখন তাহাও আক্রান্ত হইল, তখন তিনি শিষ্যসহ পলায়ন করিয়া নেপালে গেলেন। তাঁহার আগমনবার্তা শ্রবণ করিয়া ভূটানের সামন্তরাজা কীর্তিধ্বজ তাঁহাকে আপন রাজ্যে নিমন্ত্রণ করিলেন। বিক্রমশীলার সংঘরাজ কয়েক বৎসর তথায় রহিলেন। পরে তিনি পার্বত্যপথে স্বীয় জন্মভমি কাশ্মীরে গিয়া ১২২৬ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করিলেন। মাননীয় শাক্যশ্রী-র ন্যায় কত ধর্মাচার্য দেশান্তরে গিয়া আশ্রয় লইয়াছেন ও দেহরক্ষা করিয়াছেন- তাহার খবর কে রাখে? বৌদ্ধদের ধর্মীয় নেতা গৃহীরা নহেন- ভিক্ষুরাই ছিলেন। তাঁহাদের পক্ষে স্থানান্তরে গমন সহজ ছিল। ধর্মীয়-নেতার অভাবে বৌদ্ধধর্ম বহুদিন ঠিকভাবে চলিতে পারে নাই। [-বৌদ্ধ সংস্কৃতি] এই সময়কে লক্ষ্য করিয়া পাণ্ডিতেরা বলেন:

'ত্রয়োদশ শতাব্দীতে...মগধের লোকেরা উপর্যুপরি শত্রুর আক্রমণে, অবশেষে মুসলমানের অত্যাচারে বিধ্বস্ত হইয়া বঙ্গদেশে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। তাহাদের কতক তিব্বত, নেপাল প্রভৃতি স্থানে গিয়াছিলেন; কতক চট্টগ্রাম প্রভৃতি স্থানে উপনিবিষ্ট হইয়া রহিলেন।"

- বৃহৎ বঙ্গ, ৩২৫ পৃঃ

তুর্কীদের আক্রমণে নিহত ও পলায়িতেরা ব্যতীত যাঁহারা রহিলেন, তাঁহারা ধর্মান্তরিত হইতে ও রাজকীয়ধর্ম গ্রহণে বাধ্য হইলেন। এই কারণে দেখা যায়, ধ্বংসপ্রাপ্ত বৌদ্ধ বিহারের সংলগ্ন অঞ্চলে বড় বড় মুসলমান বস্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। ওদন্তপুর বিশ্ববিদ্যালয় বিহারশরিপ-এ পরিণত হইল। সোমপুর, জলদ্দল সর্বত্র মুসলমান প্রধান অঞ্চল হইল। পক্ষান্তরে, চণ্ডীদাসের ন্যায় অনেকে হিন্দু হইয়া গেলেন। পণ্ডিতেরা বলেনঃ "বাঙ্গালার অর্ধেক বৌদ্ধ-মুসলমান হইয়া গেল এবং অপর অর্ধেক ব্রাহ্মণের শরণাগত হইল, আর বৌদ্ধদিগের মধ্যে যাহারা নিজের পায়ে দাঁড়াইবার চেষ্টা করিল- মুসলমান ও ব্রাহ্মণ উভয় পক্ষ হইতেই তখন তাহাদের উপর নির্যাতন উপস্থিত হইল। ...মুসলমান অধিকারের পরে নূতন সমাজে যাহারা অনাচরণীয় হইল বৌদ্ধধর্ম শেষে তাহাদের মধ্যে নিবদ্ধ হইয়া পড়িল। তাহারা ক্রমে প্রজ্ঞা, উপায় ও বোধিসত্ত্ব ভুলিয়া গেল, শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ, করুণাবাদ ভুলিয়া গেল; দর্শন ভুলিয়া গেল, শীল বিনয় ভুলিয়া গেল; তখন রহিল জন কতক মূর্খ ভিক্ষু অথবা **ভিক্ষু নামধারী বিবাহিত পুরোহিত। তাহারা আপনার মত করিয়া বৌদ্ধধর্ম গড়িয়া লইল।"**

-হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী, ৪২৪ পৃঃ

পণ্ডিতদের মতে "সেকালে বিদ্যাচর্চার প্রধান কেন্দ্র ছিল বৌদ্ধ বিহার...। ...তুর্কীরা বৌদ্ধ বিহার সব ভূমিস্যাৎ করিলেন। দুইশ-আড়াইশ বৎসর ধরিয়া দেশ যেন অন্ধকারময় হইয়া রহিল। এই জন্য... এই দুই শতাব্দীতে বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুশীলনের কোন নিদর্শন স্থায়ী হয় নাই।"

-বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা, ৬ পৃঃ

বৌদ্ধ কবি দুর্লভ মল্লিক-কৃত 'গোবিন্দচন্দ্র গীত' চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে রচিত। ইহা বঙ্গভাষার ঐতিহাসিক আদি কাব্য। ইহাতে হাড়িপা নামক এক তান্ত্রিক-যোগীর অলৌকিক মহিমা বর্ণিত হইয়াছে। পটিকেবার রাজশক্তি তখনও বৌদ্ধদের হাতে ছিল।

পঞ্চদশ শতাব্দী হইতে বাঙ্গালা ভাষায় কিছু ধর্ম-মঙ্গল সাহিত্য রচিত হয়। বৌদ্ধদের মধ্যে তখন ধর্মপূজা পদ্ধতি প্রচলিত হয়। রমাই পণ্ডিতের- 'শূন্যপুরাণ'

ও চন্ডীদাসের- 'পদাবলী' ঐ সময়ের রচনা। কালের প্রভাবে পড়িয়া চণ্ডীদাসকে ধর্মমত পরিবর্তন করিতে হইয়াছে। "চণ্ডীদাসের জীবনে (১৫০০ খৃঃ) তিনবার তিন রকম পরিবর্তন ঘটিয়াছিল। যখন তিনি বাসুলীর সেবক- তখন তিনি খাঁটি বৌদ্ধ। যখন রামী রজকিনীর সেবক- তখন খাঁটি সহজিয়া; আবার রাধাকৃষ্ণের যুগল-মূর্তির সেবা করিয়া তিনি বৈষ্ণব সহজিয়া হইয়া গেলেন।"

-হরপ্রসাদ রচনাবলী, ২৮৭ পৃঃ

"ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলি বৌদ্ধরাজা ও সাধুগণের মহিমা কীর্তন করিতেই প্রথমে রচিত হইয়াছিল। ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণহস্তে শ্রমণগণ হৃতসর্বস্ব ও পরাভূত হইলেন। ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধভিক্ষুর আসনগুলি আয়ত্ব করিয়া ভারতবিজয়ী যে পূজার আয়োজন করিলেন, তাহাতে বাইতি, হাড়ি প্রভৃতি জাতির ধর্মযাচকত্ব রক্ষিত হইল না।"

-বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৪৭২ পৃঃ

এইরূপে ক্ষীয়মান বৌদ্ধেরা ক্রমশঃ ধর্মান্তরিত হইতে লাগিল। পণ্ডিতেরা বলেনঃ "তিব্বতে, নেপালে, কামরূপে, পূর্ববঙ্গে প্রচলিত মহাযানী, বজ্রযানী, বৌদ্ধ-তান্ত্রিকতাবাদ নিয়ে এসেছিল অনাচার অভিচার। ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্মের প্রায় শেষ ইতিহাস কিছুটা তান্ত্রিকতার মধ্যে, কিছুটা বৈষ্ণব আগমে, কিছুটা সহজিয়া আউল, বাউল, নাথদের মধ্যে লুপ্ত হইয়া গেল।"

- ভারতবর্ষ, আশ্বিন, ১৩৫৭ বাং

রাউলী পুরোহিত

কোন্ অশুভ মুহূর্তে বৌদ্ধধর্মাচার্যদের মধ্যে বিবাহপ্রথা প্রচলিত হইল, তাহা এখনও অজ্ঞাত। এই বিবাহিত পুরোহিত নেপাল, তিব্বত, কোরিয়া ও জাপান প্রভৃতি মহাযান ধর্মপ্লাবিত দেশে দেখা যায়। বাঙ্গালার প্রাচীন সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যায়, আউল, বাউলদের ন্যায় 'রাউল' নামে একটা পুরোহিত সম্প্রদায় কোন কোন স্থানে ছিলেন। 'গোর্খবিজয়' গ্রন্থে দেখা যায়ঃ

"এক এক রাউআলের ঘরে সাত পাঁচ মাই,
ষোলশত কদলী মাঝে একেশ্বর মীনাই।" -৩৪ পৃঃ

"ভাল কথা রাউলানী এ বলিয়া বচন,
মীনেরে দেখিতে মোর শ্রদ্ধা লএ মন।" - ৪১ পৃঃ

অন্য গ্রন্থেঃ

"রাবুলেঁ দিল মোহ কথু ভণিআ।" -চর্যাগীতি

"কবন যোগী কবন রাবল কবন ধান কবন চাবল।"

- প্রাণ সংগনি

"ষোল-সংখ্য বন্দো রাউলের বত্রিশ আমিনী,
একদণ্ডে তেজিবে রাউলের বাসঘর।"

-রূপরামের ধর্মমঙ্গল

" যোগ ধেয়ানি রাউল পরম গিয়ানি,
চিন্তিয়া পরম পদ হইল ধিয়ানি।"

-বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম খণ্ড, ২য় সংস্করণ।

'গোর্খবিজয়' শব্দ-সূচীতে ২৬৬ পৃষ্ঠায় অর্থ লিখিত হইয়াছেঃ

রাউআল- গৃহস্থ-যোগী, রাজকর্মচারী, রাজপুত্র।
রাউলানী-রাউআলের স্ত্রী।

চাক্‌মা বৌদ্ধসমাজে– এই 'রাউলী পুরোহিত' এখনও বিদ্যমান। "চাক্‌মা জাতির ইতিহাসে" আছে ঃ "প্রাচীন যুগের বহু ধর্মগ্রন্থ বিলুপ্ত হইলেও বর্তমানে যে সকল ধর্মগ্রন্থ আছে, তদ্বারা পূর্বে রাউলী সম্প্রদায় [অনুপসম্পন্ন শ্রামণ-এর] দ্বারাই ঐ সকল ধর্ম-কর্ম অর্থাৎ পৌরোহিত্য-কার্য সম্পন্ন হইত। [পাদটীকা] "ইউরোপীয়ান পর্যটক রালফ্ ফীচ্ ব্রহ্মদেশের ভিক্ষুদিগকে 'রোলী' বলিয়াছেন। (ইণ্ডিকা দেখুন) শঙ্করাচার্যের বদরিকাশ্রমে 'রাউলীকে' পূজারী বলা হইয়াছে।"]

-৫৭ পৃষ্ঠা

বড়ুয়া সমাজে যধরা রাউলী, থান রাউলী, খুদ্যা রাউলী, চান রাউলীর গোষ্ঠী বা বংশপরম্পরা এখনও রহিয়াছে। রাউলীর রাস্তা, রাউলীর পোল, হাট, দীঘি, পুকুর, ভিঠা, ঘাট প্রভৃতির নিদর্শন তদানীন্তন বৌদ্ধ-পুরোহিতদের স্মৃতি বহন করে। প্রতিবেশী অপর জাতির নিকট বৌদ্ধ-পুরোহিতেরা এখনও 'রাউলী' নামে পরিচিত। আরাকানী ভাষায় পুংগ্রী উপাধিধারী কয়েকটি পুরোহিত গোষ্ঠী সমাজে পরিদৃষ্ট হয়, যথাঃ আরিপা পুংগ্রী, আনপ্পা, মোরপ্পা ও হাসিপা পুংগ্রী প্রভৃতি। তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য হাড়িপা, কাণুপা, তিলোপা প্রভৃতি নামের সহিত ইহাদের নামের সামঞ্জস্য আছে। এই সকল গৃহী-পুরোহিতেরা বংশপরম্পরায় বৌদ্ধসমাজে কালীপূজা, দূর্গাপূজা, মনসাপূজা প্রভৃতিতে পশুবলি পর্যন্ত স্বহস্তে সম্পাদন করিতেন। থেরবাদের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহারা বিবাহ ও পশুহত্যাপ্রথা পরিত্যাগ করিলেন। বৌদ্ধ বিহারগুলি ধ্বংস হইয়া গেলে ব্রহ্মচারী বজ্রাচার্যের অভাব ঘটিল এবং ধর্মগ্রন্থও বিনষ্ট হইল। এই সময় রাউলীরা থেরবাদ ভিক্ষু

হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া সপ্তাহকাল দশশীল পালন করিতেন। তৎপর গৃহী হইয়া কাষায়বস্ত্রগুলি ঘরে রাখিতেন। গৃহস্থালীর সমস্ত কাজকর্ম করিতেন। আর ধর্মীয় অনুষ্ঠানের সময় কাষায়বস্ত্র কণ্ঠে জড়িত করিয়া পৌরোহিত্য করিতেন। এই সময় থেরবাদের সঙ্গে মহাযানের সংমিশ্রণ ঘটে। পরবর্তীকালের সম্বন্ধে "সদ্ধর্ম রত্নাকর" বলে ঃ "ভিক্ষুদের মধ্যে তিনটি শ্রেণী ছিল– মাথে, কামে ও পাঞ্জাং। নিমন্ত্রণে যাওয়ার সময় কামেগণ হুতুক পরিতেন, পাঞ্জাংগণ মস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া যাইতেন এবং মাথেগণ বৃহৎ ছত্রধারণ করাইয়া যাইতেন। তাঁহারা শ্রামণকে সীমায় নিয়া কর্মবাক্য পাঠান্তে উপসম্পদা দিতেন বটে, কিন্তু সীমা হইতে বিহারে আনয়ন করিয়া তাঁহাদিগকে দশশীল দিতেন।" [৪৪২ পৃঃ] এই আলোচনায় প্রমাণিত হয় যে, চাকমা রাউলী কিংবা বড়ুয়া রাউলী কাহারো থেরবাদ উপসম্পদা ছিল না- তাঁহারা দশশীলধারী শ্রামণ মাত্র ছিলেন। ঊনবিংশ শতকের ষষ্ঠ দশকে বাঙ্গালার তান্ত্রিক পুরোহিত রাউলীদের মধ্যে প্রকৃতপক্ষে ধর্মসংস্কারের যে উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়, উহার প্রেরণা আরাকানের থেরবাদী ভিক্ষুসংঘ হইতে আসে।

সংঘরাজ সারমেধ

"ওই হের আসে সারমিত্র সংঘে শ্রেষ্ঠ আসন যাঁর,
তুচ্ছ অসার করি পরিহার লভিলে কাম্যজীবন সার।"

পূণ্যশ্লোক সংঘরাজের নাম উচ্চারণ-বিপর্যয়বশতঃ বাংলা ভাষায় সারমিত্র হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার নাম– সারমেধ মহাথের।

খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে আরাকান রাজবংশের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের মধ্যে অন্তর্বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। উহা কয়েক বৎসর চলিতে থাকে। এই সুযোগে স্বাধীন ব্রহ্মের সম্রাট বোধ-ফ্রা (১৭৮১-১৮১৯) ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে আরাকান আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে আরাকানবাসীরা নানাভাবে অত্যাচারিত হয়। শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে নির্যাতিত ও নিহত হয়। দীর্ঘদিন সংগ্রাম চলার ফলে দেশের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে। হাজার হাজার আরাকানী বাস্তত্যাগ করিয়া চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই সময় রাজপরিবারের সম্পর্কিত কিছু লোক শ্রদ্ধেয় সারালঙ্কার মহাথেরের সহিত আসিয়া হাড়ভাং অঞ্চলে উপনিবিষ্ট হয়। তথায় ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ভাবী-সংঘরাজ সারমেধের জন্ম হয়।

অভিজ্ঞ জ্যোতির্বিদেরা বালকের হস্তরেখা দেখিয়া ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন

যে, 'এই বালক ভবিষ্যতে রাজা হইবেন। কিন্তু রাজনৈতিক বিপর্যয়ে তাঁহার জীবননাশের আশঙ্কাও আছে।' গণকদের পরামর্শ অনুসারে মাতা-পিতা অল্প বয়সে তাঁহাকে আচার্য সারালঙ্কার মহাথেরের নিকট শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষাদান করেন। এই নবদীক্ষিতের নাম রাখা হয় শ্রামণ সারমেধ।

সারমেধ গুরুর সান্নিধ্যে থাকিয়া উত্তমরূপে ধর্ম-বিনয় ও প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষালাভ করিলেন। যোগ্যতা অর্জিত হইলে সারালঙ্কার মহাথেরের উপাধ্যায়ত্বে ১৮২১ সালে তাঁহার শুভ উপসম্পদাকার্য সমারোহে সম্পদিত হয়।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ বগিড্ ও বৃটিশ পক্ষের মধ্যে 'য়্যাগুবো সন্ধি' স্থাপিত হয়। ইহার ফলে আরাকান বৃটিশ ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর বাঙ্গালা সরকারের অধীন হইল। তখন আরাকান ও চট্টগ্রামের মধ্যে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হয়। এই সময় বহু সংখ্যক শরণার্থী চট্টগ্রাম হইতে পুনরায় আরাকানে ফিরিয়া যায়। আচার্য সারালঙ্কার মহাথেরও বৃদ্ধবয়সে তাঁহার শিষ্য সারমেধ ভিক্ষু সহ আকিযাবে প্রত্যাবর্তন করেন। আকিয়াবের কয়েকজন দাতা ছেরাগ্যা নদীর দক্ষিণ তীরে গদুভাঙ্গা খাড়ির উপকূলে এক বিহার নির্মাণ করিয়া তাঁহাদিগকে দান করেন। ইহার নাম হয় 'সারালঙ্কার বিহার'। আচার্য সারালঙ্কার অধ্যক্ষ ও সারমেধ সহকারীরূপে বিহারের যাবতীয় কার্য নির্বাহ করিতেন। তাঁহাদের শিক্ষা ও চরিত্র মাধুর্যে আরাকান ধর্ম-বিনয়ে ক্রমশ: উন্নত হইয়া এক আদর্শ বৌদ্ধ রাষ্ট্রে পরিণত হয়। তদানীন্তন যুদ্ধ-বিধ্বস্ত, বিশৃঙ্খল আরাকানের মধ্যে তাঁহাদের চারিত্রিক দৃঢ়তার ফলে ধর্মীয়-শৃঙ্খলা স্থাপিত হইল। তাঁহাদের প্রতি জনগণের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। এই সারালঙ্কার বিহার জনসমাজে অতিশয় পরিচিত হইয়া উঠে। ১৮৩৬ সালে আচার্য সারালঙ্কারের মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য সারমেধ থের এই বিহারের অধ্যক্ষপদ লাভ করেন।

শ্রদ্ধেয় সারমেধ থের নূতন উদ্যমে সদ্ধর্মের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি চট্টগ্রাম ও আরাকানের সর্বত্র পর্যটন করিয়া ধর্মপ্রচার করিতেন। তখন সবেমাত্র বৃটিশশাসন প্রতিষ্ঠিত, আকিয়াব সমগ্র আরাকানের প্রশাসনিক কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছে। আমদানী-রপ্তানির প্রধান কেন্দ্র আকিয়াবের প্রতিপত্তিশালী নাগরিকবৃন্দ, সরকারি কর্মচারী ও বণিককূলের সহায়তায় স্থানীয় ভিক্ষু-সংঘের চর্তুপ্রত্যয় ও গ্রন্থাদি অনায়াসলব্ধ হইল। সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার ও বিনয়ানুকূল আচরণের দরুণ আচার্য সারমেধের যশ-খ্যাতি ও প্রতিপ্রত্তি দূর-দূরান্তরে- বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল।

আরাকানের প্রাচীন রাজন্যবর্গ সদ্ধর্মের উন্নতি ও দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত

প্রতিষ্ঠাবান মহাথেরদিগকে বিবিধ সম্মানজনক উপাধিতে বিভূষিত করিতেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের সকল সম্প্রদায়ের নিজ নিজ আন্দোলনের সমান অধিকার স্বীকার করিয়াছেন। রাজার প্রতি প্রজাপুঞ্জের আনুগত্য বৃদ্ধির নিমিত্ত আরাকানের তৎকালীন জিলা জজ উঃ ফা-তা-ঠোয়ে মহোদয় দিগন্ত বিশ্রুত শাসনহিতকামী মহামান্য সারমেধ মহাথেরকে রাজকীয় উপাধিদানের প্রস্তাব করেন। বৃটিশ সরকার ইহাতে সাগ্রহে সম্মত হন। ১৮৪৬ সালের ফাল্গুনী-পূর্ণিমার এক বিরাট সমারোহে পণ্ডিতাগ্রগণ্য সারমেধ মহাথেরকে নিম্নোক্ত রাজকীয় উপাধিসমন্বিত সীলমোহর প্রদত্ত হয় ঃ

"সারমেধালঙ্কারাভি-তিসাসনধর
মহাধম্মরাজাধিরাজগুরু।"

এই সময় আরাকান ও বঙ্গদেশ একই সরকার-শাসিত হওয়ায় এবং গমনাগমনের সুব্যবস্থা থাকায় শ্রদ্ধেয় রাজাধিরাজগুরু সারমেধ মহাথেরের খ্যাতি বাংলার প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। আরাকানীরা চট্টগ্রাম ও পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে বাণিজ্য-ব্যপদেশে বসবাস করিতেন। বাংলা তথা চট্টগ্রামের লোকেরাও আরাকানে গিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। পূর্ব-চট্টগ্রামে চাক্‌মা বৌদ্ধগণ বাস করিতেন। তাঁহারা নিজেদের শাক্যবংশসম্ভূত আর্যজাতির বংশধর বলিয়া দাবী করেন। তাঁহাদের দক্ষিণে ও উত্তরে আরাকানীবংশসম্ভূত ' বোমাং' ও 'মান' সম্প্রদায়ের বাস। শ্রদ্ধেয় সারমেধ মহাথের মহোদয় স্বজাতিদের নিকট সময় সময় আসিয়া ধর্মপ্রচার করিতেন। তখন বড়ুয়া ও চাক্‌মা সমাজের মধ্যে তাঁহার প্রভাব তেমন ছিল না। কারণ তাঁহাদের ধর্মগুরু ছিলেন তখনকার 'তান্ত্রিক-রাউলী' সম্প্রদায়।

১৮৫৬ সালের চৈত্র মাসে মাননীয় রাজগুরু সারমেধ সশিষ্যে তীর্থ ভ্রমণ উপলক্ষে সীতাকুণ্ড আগমন করেন। তথায় শ্রদ্ধেয় রাধু মাথের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁহার আত্মজীবনীর ১০ম পৃষ্ঠায় আরাকানী অক্ষরে ও ভাষায় লিখিত আছে ঃ "তথায় ভ রু আ রাউলী রাধারাম তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন।" জীবনী-সম্পাদক উহার পার্শ্বে বন্ধনীর মধ্যে লিখিয়াছেন ঃ 'BARUA RAULI'।

চাক্‌মা সমাজের পুরোহিতগণকে যেমন "চাক্‌মা-রাউলী" বলা হয়, তদ্রুপ বড়ুয়া সমাজের পুরোহিতগণও তখন "বড়ুয়া-রাউলী" নামে পরিচিত ছিলেন।

সংঘরাজ মহোদয় সদলবলে রাধু মাথের সহিত সীতাকুণ্ড হইতে চক্রশালা হইয়া মহামুনি মেলায় উপনীত হন। মহামুনি বাংলার চাক্‌মা, বড়ুয়া, মান,

বোমাং প্রভৃতি সকলশ্রেণীর বৌদ্ধদের মিলন-তীর্থ। তাঁহার ধর্ম-সংস্কারের আলোচনায় সকলেই সন্তুষ্ট হন। তাঁহার জন্য শাক্যমুনি মন্দিরের পার্শ্বে এক পর্ণকুটির নির্মিত হয়। তাহাতে তিনি প্রায় দুই বৎসরকাল যাপন করেন। এই সময় তিনি বড়ুয়া ও চাক্‌মা সমাজের সর্বত্র বিচরণ করিয়া তান্ত্রিকমতের অসারতা, বিশেষতঃ দেব-দেবীর পূজায় পশুবলির বিরুদ্ধে প্রচারকার্যে করেন। ইহার ফলে প্রায় বৌদ্ধ-জমিদারদের বাড়ি হইতে কালী, দুর্গা, শিব প্রভৃতি পূজা তিরোহিত হয়।

এই সময় বৃটিশের সামন্তরূপে চাক্‌মা রাজারাই চট্টগ্রামের পূর্বাঞ্চল শাসন করিতেন। ইহারা মোগল ও আরাকান রাজাদের সময় কখনও স্বাধীন, কখনও করদ-মিত্ররূপে রাজত্ব করিতেন। এই বংশের অধিরাণী পূণ্যশীলা কালিন্দী রাণী মহোদয়া তখন রাজ্যের শাসনকর্ত্রী। ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণানুযায়ী তিনিও জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে সকল প্রজার প্রতি সমান ব্যবহার করিতেন। তিনি হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদের জন্য কালীমন্দির ও মসজিদ নির্মাণ করিয়া উহাদের সেবাপূজার নির্মিত্ত দেবোত্তর সম্পত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার প্রাসাদের পার্শ্বে বৌদ্ধবিহার বিদ্যমান। উহার সেবা-পূজার ব্যয়ভার রাজ সরকার বহন করেন। আচার্য সারমেধ মহাথেরকে তিনি রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ করিলেন। সংঘরাজের উপদেশে ও ব্যবহারে তিনি শ্রদ্ধাভিভূতা হইয়া পড়েন। 'বৌদ্ধবন্ধু পত্রিকা' বলে ঃ "রাণী মহোদয়া সংঘরাজের শুভাগমনের পরেই তাঁহা কর্তৃক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিতা হইয়াছেন।" [-১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা] প্রকৃতপক্ষে রাণী মহোদয়া তান্ত্রিক-বৌদ্ধ হইতে থেরবাদ-এ পরিবর্তিত হইয়াছেন।

শ্রদ্ধাপরায়ণা রাণী অতিশয় প্রসন্ন হইয়া ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে রাজকীয় পূণ্যাহ উপলক্ষে মহাসমারোহে শ্রদ্ধেয় সারমেধ মহাথেরকে আরাকানী ভাষায় উপাধিযুক্ত সীল-মোহর প্রদানে সম্মানিত করেন। উহার অর্থ এইঃ

"1219 A. E. The Seal of Arakanese Sangharaja and Vinayadhara."

তাঁহার পক্ষে ইহা দ্বিতীয়বার রাজকীয় উপাধিলাভ। তদবধি তিনি সংঘরাজরূপেই প্রসিদ্ধ হন এবং তাঁহার সারালঙ্কার বিহার সংঘরাজ বিহারে পরিণত হয়। পূণ্যশীলা কালিন্দী রাণীর প্রদত্ত সম্মানিত উপাধিলাভ করিয়া তিনি আকিয়াব ফিরিয়া যান। তাঁহার এই পর্যটনে গৃহী-বৌদ্ধেরা কিছুটা সংস্কৃত হইলেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত চট্টগ্রামের "রাউলী পুরোহিতগণ" থেরবাদ অনুসারে সমগ্রভাবে উপসম্পদা গ্রহণে সম্মত হইতে পারেন নাই।

চট্টগ্রামের তদানীন্তন ভিক্ষু শ্রদ্ধেয় চন্দ্রমোহন ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মহানগর

বিহারে অবস্থান করিতেন। সেই সময় জরিপ বিভাগের উচ্চপদস্থ জনৈক ইংরেজ কর্মচারী মিঃ পাল [Mr. Paul] সিংহল হইতে বদলী হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি বৌদ্ধধর্মে সুপণ্ডিত ছিলেন। ভিক্ষু চন্দ্রমোহন তাঁহার নিকট 'ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ' অধ্যয়নকালে স্বীয় উপসম্পদা সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হন। কারণ তিনি ১৬ বৎসর বয়সে শ্রদ্ধেয় ঁমোহন মাথের উপধ্যায়ত্বে তথাকথিত উপসম্পদা লাভ করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি বিচলিত হইয়া পড়েন এবং রাজা কিংবা সিংহলে গিয়া পুনঃ উপসম্পদা গ্রহণ ও ধর্ম-বিনয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। আরাকানে বৃটিশ সরকার ও চট্টগ্রামে কালিন্দী রাণী কর্তৃক সম্মানিত সংঘরাজ আচার্য সারমেধ মহাথেরের বিষয় শুনিয়া তিনি যথার্থ উপসম্পদা গ্রহণে মানসে ১৮৬০ সালে আকিয়াব গমন করেন। তথাকার সংঘরাজ বিহারে উপনীত হইয়া কয়েক মাস বিনয়-ধর্ম চর্চা করেন। আর তথাকথিত পূর্ব-উপসম্পদা ত্যাগ করিয়া সংঘরাজের উপাধ্যায়ত্বে স্থানীয় ভিক্ষু-সংঘ কর্তৃক 'উদক-উপেক্ষা সীমায়' পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করেন। ইহার দুই মাস পরে চট্টগ্রাম ফিরিয়া আসেন এবং রোগের দরুণ ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

এই ঘটনায় বাংলার বৌদ্ধদের ভুল ধরা পড়িল এবং থেরবাদ মতে প্রকৃত উপসম্পদা গ্রহণের আগ্রহ জন্মিল। তজ্জন্য তাঁহারা সংঘরাজ সারমেধ মহাথেরকে চট্টগ্রাম আগমণের আহবান জানাইলেন। তিনি ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বিনয়কর্মের উপযোগী ভিক্ষুগণ সমভিব্যাহারে জলপথে চট্টগ্রাম আগমণ করেন। তাঁহারা পাহাড়তলী আসিয়া তাঁহার জন্য পূর্বনির্মিত বিহারেই উঠিলেন। এখানে বিনয় সম্বন্ধে আলোচনার পর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হইল যে, চট্টগ্রামের "বড়ুয়া রাউলীরা" পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করিয়া দেশে থেরবাদের অনুগামী প্রকৃত ভিক্ষুসংঘ প্রতিষ্ঠা করিবেন। যথাসময় উপসম্পদার আয়োজন হইল। মহামুনির পূর্বপার্শ্বে 'হাঞ্চার ঘোণা"য় এক পার্বত্যছড়ায়– সংঘরাজের স্বীয় ভাষায় "নদী সীমায়" শ্রদ্ধেয় জ্ঞানালঙ্কার [লালমোহন ভিক্ষু] প্রমুখ সাতজন মহাযানী পুরোহিত সর্বপ্রথম নূতনভাবে থেরবাদসম্মত উপসম্পদা গ্রহণ করিলেন। এইবারও শ্রদ্ধেয় সংঘরাজ এক বৎসর চট্টগ্রামে অবস্থান করিয়া ভিক্ষুদিগকে ধর্ম-বিনয় শিক্ষা দিলেন। ইতিমধ্যে আরো অনেক মাথে সশিষ্যে তাঁহার নিকট উপসম্পন্ন হইলেন। এতদিনে মহাযানের তান্ত্রিক পুরোহিতদিগের মধ্যে প্রকৃত উপসম্পদা প্রতিষ্ঠিত হইল। নব উপসম্পন্ন ভিক্ষু-সংঘের নাম হইল- 'সংঘরাজ নিকায়'। কিন্তু কতিপয় প্রাচীনপন্থী মাথে উমেশবাবুদের মত কিছু সংখ্যক গোঁড়াপন্থী দায়কের প্ররোচণায় কল্পিত মযাদাহানির ভয়ে সংঘরাজের নিকট উপসম্পদা

গ্রহণের পূর্বসিদ্ধান্ত ত্যাগ করিয়া পৃথক রহিয়া গেলেন। তাঁহারা হইলেন– 'মাথের দল'-এর ভিক্ষু। সংঘরাজ নানাস্থানে ধর্মপ্রচার করিয়া আকিয়াব চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় বৃটিশ-বার্মা যুদ্ধের (১৮৫২-৫৩) পর নিম্ন-বার্মা বৃটিশের অধিকারভুক্ত হয়। এই অবস্থাতেও ব্রহ্মরাজ মিন্‌ডন্ বৌদ্ধধর্মের স্থিতি ও উন্নতির জন্য বহু প্রয়াসে নিবিষ্ট। তিনি ১৮৬০ হইতে ১১ বৎসর ব্যাপী মান্দালয়-এ সমগ্র ত্রিপিটক পাষাণফলকে উৎকীর্ণ করান। শেষের দিকে ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক সদ্ধর্ম-সংগায়ণের ব্যবস্থা করেন। ইহাই ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পঞ্চম বা 'শিলালিপি সংগীতি'।

এই পঞ্চম সংগীতির অধিবেশনকালে ১৮৬৬ অব্দে স্বাধীন ব্রহ্মের মহামান্য সংঘরাজ জ্ঞেয় ধর্মাভিবংশ শ্রীপ্রবরালঙ্কার ধর্মসেনাপতি মহাধর্মরাজাধিরাজগুরু মহোদয় দেহত্যাগ করেন। তিনি সর্বজনমান্য কোন ধর্ম-উত্তরাধিকারী রাখিয়া যান নাই। সেই কারণে আর কাহাকেও সংঘরাজ করা হয় নাই। সেই কারণে আর কাহাকেও সংঘরাজ করা হয় নাই। এখানেই প্রাচীন সংঘরাজপ্রথার অবসান ঘটে। তখন ধর্মীয়কার্যাদি সম্পাদনের নিমিত্ত বিভিন্ন অঞ্চলের রাজগুরু উপাধিপ্রাপ্ত ৮ জন প্রতিনিধিস্থানীয় মহাথেরকে নিয়োগ করা হয়। তাঁহাদের সম্মিলিত নেতৃত্বে সংগীতি ও শাসনকার্যে পরিচালিত হইতে থাকে।

ধর্মরাজ মিন্‌ডন্ বৃটিশ সরকারের মাধ্যমে আরাকানের নায়ক মহাথেরকে সংগীতিতে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান। ভারত সরকার মাননীয় সংঘরাজ ও তাঁহার শিষ্য উঃ অগ্‌গ মহাথেরকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়া তথায় প্রেরণ করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বর্ষাবাসের পূর্বে সংঘরাজ সশিষ্যে মান্দালয় উপনীত হন। পাহাড়তলীর নিত্যানন্দ মুচ্ছদ্দীও তাঁহার সেবকরূপে তখন মান্দালয় গমন করেন। ধর্মরাজ মিন্‌ডন্ তাঁহাদিগকে মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করিলেন। ত্রিপিটক পাষাণফলকে উৎকীর্ণ করিবার পূর্বে প্রতিবিশোধকার্য সমাধা করিবার ভার সসম্মানে তাঁহাকে অর্পণ করা হয়। তিনি এক বর্ষায় এই মহান কর্তব্য দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিলেন। এই সহযোগিতার জন্য সন্তুষ্ট হইয়া ধর্মরাজ মিন্‌ডন্ এক সভায় তাঁহাকে উপাধি ও সীলমোহর দিয়া সম্মানিত করিলেন ঃ

"সারমেধাভি তিসাসনধজ
মহাধম্ম-রাজাধি-রাজগুরু।"

ইহা তাঁহার পক্ষে তৃতীয়বার রাজকীয় সম্মান ও উপাধিলাভ। তিনি সৌজন্য সহকারে রাজদত্ত সম্মান অনুমোদন করিলেন। অতঃপর সংঘরাজ আরাকান প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজা মিন্‌ডন্ ধর্মপ্রচারে সহায়তাকল্পে

২৫ জন বার্মা মহাথেরকে সংঘরাজের সঙ্গে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা আকিয়াব পৌঁছার কয়েক মাস পরে চাক্‌মা রাজ্যেশ্বরী কালিন্দী রাণীর আহব্বানলাভ করেন। তিনি ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দের প্রথম ভাগে রাজানগর সীমাপ্রতিষ্ঠায় যোগদান করেন। ঐ সীমার 'চিং' নাম তাঁহারাই প্রদত্ত।

শ্রদ্ধেয় সংঘরাজ সারমেধ ত্রিমুকুটধারী হইয়া আরও তের বৎসর জীবিত ছিলেন। ইতিমধ্যে ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে শেষবারের মত চট্টগ্রাম ভ্রমণ করেন। স্থানীয় সংঘরাজ-নিকায় পরিচালনার ভার তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য আচার্য পূর্ণাচার ধর্মধারী মহাথেরের উপর অর্পণ করেন। তাঁহার সমগ্র জীবন পরিয়ত্তি, প্রতিপত্তি ও প্রতিবেধ এই ত্রিবিধ সদ্ধর্মের উন্নতি ও প্রচারকল্পে অতিবাহিত হয়। তিনি 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়' সারাজীবন চর্চায় রত ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ গুণাবলী ও বিচিত্র কর্মপ্রতিভার বিষয় ভাষায় বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ৮১ বৎসর বয়সে ৬১তম উপসম্পদাবর্ষে এই মহাপুরুষ গুণমুগ্ধ সকলকে শোক সাগরে ভাসাইয়া ইহলোক সংবরণ করেন। আরাকানের তথা বৃটিশ বৌদ্ধ-ভারতের গৌরবরবি অস্তমিত হইল। শ্রদ্ধেয় সংঘরাজের আচার, বিনয়-নম্র ব্যবহার ও কার্যপ্রণালী ভাবীজনগণের হৃদয়ে চিরকাল আদর্শস্থানীয় হইয়া রহিবে।

বৌদ্ধেরা কি অহিন্দু?

'মুকুট রায় ও শুকদেব রায় আরাকানরাজের সামন্ত-নৃপতি এবং বাঙ্গালী বৌদ্ধদের পূর্ব পুরুষ ছিলেন।' আমি ইহা বলায় মুচ্ছদ্দীবাবু প্রতিবাদ করেন ঃ "মুকুট রায় ছিলেন হিন্দু আর শুকদেব রায় ছিলেন চাক্‌মা, থেরবাদ উধাও হইয়া গেল।" - শেষ বক্তব্য, ৬ পৃঃ

তাঁহার পূর্বের উক্তিঃ

- "১৬৬৬ পর্যন্ত আরাকানের রাজা চট্টগ্রাম শাসন করেন। তখন বড়ুয়াগণের পূর্বপুরুষেরা আরাকানরাজের সামন্ত-নৃপতিরূপে এদেশ শাসন করিতেন।" - মাতৃপূজায় মানবধর্ম
- "তখন বড়ুয়াগণ সর্বেসর্বা ছিলেন এবং আরাকানরাজের সামন্ত-

নৃপতিরূপে এদেশ শাসন করিতেন।" - বড়ুয়া জাতি, ৯-১০ পৃঃ

এই যে 'সর্বেসর্বা বড়ুয়া' ও 'তাঁহাদের পূর্বপুরুষেরা' রায়গণ ছাড়া আর কাহারা? তাঁহাদের সময়ে বাঙালি বৌদ্ধেরা থেরবাদী ছিলেন না।

বাঙালি, বিহারীর ন্যায় হিন্দু একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা। ভারতবাসী মাত্রেরই হিন্দু নাম দেওয়া যায়। প্রাচীন সংস্কৃত কিংবা -- ভাষায় এই নাম পাওয়া যায় না। মুসলমান বিজয়ের সঙ্গে এই নাম প্রচলিত হয়। তাঁহাদের কয়েক শতাব্দী রাজত্বের ফলে অভিশাপ আশীর্বাদ পরিণত হয়। এই ভৌগোলিক পরিভাষায় জৈন, বৌদ্ধ, ফার্সি, শিখ, মুসলমান সকলেই হিন্দু। পরে সংস্কৃতিগত নাম হিসাবে ইহার ব্যবহার চলে, যেমন বাঙালি হিন্দু, বাঙালি বৌদ্ধ ইত্যাদি। হিন্দু মহাসভা হিন্দুর যে সংজ্ঞা দিয়াছে, তাহাতে বৌদ্ধেরাও হিন্দুর পর্যায়ে পড়েঃ

"আসিন্ধু সিন্ধু পর্যন্তা যস্য ভারতভূমিকা,
পিতৃভূঃ পূণ্যভূশ্চৈব সবৈ হিন্দুরিতি স্মৃতঃ ॥"

দক্ষিণ মহাসাগর হইতে সিন্ধুনদী পর্যন্ত বিস্তৃত ভারতভূমি বাহার পিতৃভূমি এবং পূণ্যভূমি তিনিই হিন্দু। এই সংজ্ঞায় অনেকেই হিন্দু।

মুসলমান লেখকেরা অমুসলমান মাত্রকেই হিন্দুরূপে জানিতেন। আরাকানরাজ শ্রীচন্দ্র সুধর্মার [১৬৫২-৭১] দানকার্য ও বৃত্তিদানের প্রশংসা করিয়া কবি আলাওল লিখেনঃ

"হিন্দু জাতি নানা দুঃখে উপার্জএ মাল, (ধন)
মন্দির পুষ্কর্ণী দেয় কতেক জাঙ্গাল।
সুজনে বাড়ার বৃত্তি অনুরূপ পুণ্য,
অন্তকালে নাম রহে সেই ধন্য ধন্য।"

—বাংলা সাহিত্যের কথা, ৯৮ পৃঃ

বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আরাকানরাজের ন্যায় সদ্ধর্মী মুকুট রায়কে হিন্দু বলা অযৌক্তিক নহে। তাঁহারা হিন্দু হইলেই যে থেরবাদী হইবেন, তাহা যুক্তিযুক্ত নহে। তদানীন্ত ন তান্ত্রিক-বৌদ্ধদের পূজা-পার্বণ-এর কথা স্মরণ করিলে এই সমাজকে অহিন্দু বলা চলে না। এ সম্বন্ধে ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া, ডি, লিট্ (লণ্ডন), মহোদয়ের উক্তি অনুধাবনীয়ঃ " বেশী দিনের কথা নয় চট্টগ্রাম ও কলিকাতার বড়ুয়া সমাজে অনেকগুলি লৌকিক-পূজা প্রচলিত ছিল যথাঃ দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতীপূজা, শনিপূজা, মগধেশ্বরী পূজা, কালীপূজা, ঈষামতীর পূজা, ডাকিনীর পূজা, গ্রাম্যদেবতার পূজা, গৃহদেবতার পূজা, কার্তিকব্রত, বিষুবসংক্রান্তির উৎসব ও নবান্ন।...

প্রচলিত লৌকিক পূজা-পদ্ধতি হইতে প্রমাণিত হয় যে... বড়ুয়া (চাক্‌মা) সমাজ একটি হিন্দু বা আর্য-ভাবাপন্ন গৃহস্থ-সমাজ। শাক্তদের সহিত তাঁহাদের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ।"

– বৌদ্ধ পরিণয় পদ্ধতি, ॥ পৃঃ

লৌকিক পূজা-পার্বণে যেমন বাঙালি বৌদ্ধেরা হিন্দু ভাবাপন্ন ছিলেন, সেইরূপ ধর্মীয়-সাহিত্য চর্চায়ও তাঁহারা প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম হইতে বহুদূরে সরিয়া গিয়াছিলেন। চাক্‌মা সমাজে ১৮২০ খৃষ্টাব্দে লিখিত শিবচরণের 'গোজেন লামা' পাওয়া গিয়াছে। উহাতে গোজেনই বিশ্বের সৃষ্টিকর্তারূপে কল্পিত হইয়াছেঃ

"জলের উপরে বৈস্যে থল,
বানেল গোজেনে জীব সকল।"

-১ম লামা

'সৃষ্টি পঞ্চম' গ্রন্থে বলা হইয়াছে নিরঞ্জনই সৃষ্টিকর্তাঃ

"নিরঞ্জনে বসমতী বানেই বেড়েই চার।" - ৫ পৃঃ

সেই সময়ে বড়ুয়া সমাজে 'মঘা খন্মৌজা' নামে এক ধর্মগ্রন্থ প্রচলিত ছিল। উহাদের সাহায্যেই তান্ত্রিক রাউলীগণ ধর্মীয়কার্য পরিচালনা করিতেন। ডঃ বড়ুয়া বলেন ঃ "১৮৫০ খৃষ্টাব্দের হস্তলিখিত এক গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে। তদানীন্তন প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে "ওঁ নমঃ গণেশায়, নমঃ সরস্বতী; অথ মঘা খমুজা পুস্তক লিখ্যতে" বলিয়া গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থ আরম্ভ করিয়াছেন। প্রারম্ভে তিনি প্রভু-নিরঞ্জনকে প্রণাম করিয়াছেন; যিনি ত্রিভুবনের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কারণ। এই নিরঞ্জন-প্রভু বুদ্ধ নহেন, ইনি পরমেশ্বর।"

-সাহিত্য পরিষদ্ পত্রিকা, ৫২শ বর্ষ।

এইরূপ ভাবধারা পরবর্তী বৌদ্ধ- লেখকদের মধ্যেও সংক্রমিত হইয়াছে। কবি সর্বানন্দ বড়ুয়া 'শ্রী শ্রীবুদ্ধ চরিতামৃত' গ্রন্থে লিখিয়াছেনঃ

"ভুবনের হর্ত্তা কর্ত্তা হইয়া আপনি,
লোক শিক্ষা হেতু শুধু এসেছ ধরণী।" -ঐ, ৬৭ পৃঃ

বৌদ্ধ-বিবাহ মন্ত্রের প্রাচীন পুঁথি 'শ্রীযএ দুর্গা', 'শ্রীহরি শরণ' বলিয়া আরম্ভ হইয়াছে। ১৮৮৫ সালে উহার সংশোধিত সংস্করণে ঐ হিন্দুবাণী শব্দ তিরোহিত হইয়া আচার্য চন্দ্রমোহনের সহায়তায় তৎস্থলে 'নমোতস্‌স' স্থান লাভ করিয়াছে। এইসব দেখিয়া ডঃ বড়ুয়া বলেনঃ "প্রাচীন বিবাহমন্ত্রে ব্যবহৃত 'উ নাম্‌হ' প্রভৃতি বাক্য ব্যবহার হইতে অনুমিত হয় যে, বড়ুয়াদের অবলম্বিত বৌদ্ধধর্মের উপর মন্ত্রযান বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল এবং এখনও আছে।"

-বৌদ্ধ পরিণয় পদ্ধতি, ৩।০ পৃঃ

বিংশ শতাব্দীর প্রথমপাদ পর্যন্ত বাঙালার বৌদ্ধদের আচার-ব্যবহারে, পূজা-পার্বণে, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে হিন্দু-বৌদ্ধ সম্মিলিত তান্ত্রিক প্রভাব রহিয়াছে। সুতরাং সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকের মুকুট রায় ও শুকদেব রায়ের পোষকতায় বাঙালি বৌদ্ধেরা তান্ত্রিক মত অনুসরণ করিতে বাধা কোথায়? বস্তুত:পক্ষে, সংঘরাজের নিকট থেরবাদধর্ম গ্রহণের পরেই বৌদ্ধদের মধ্যে স্বতন্ত্র জাতীয়-চেতনা প্রবুদ্ধ হয়, মিথ্যা-দৃষ্টিপূজা পরিত্যক্ত হয়। ১৮৭৯ সালে 'চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি' গঠন উহার জ্বলন্ত নিদর্শন।

বড়ুয়া ও চাক্‌মা

'বড়ুয়া' উপাধি বৌদ্ধদের মধ্যে কোন সময় হইতে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা জানা যায় না। পঞ্চদশ শতকের পদাবলী সাহিত্যের কবি বড়ু, বড়ুয়া চণ্ডীদাস নামে খ্যাত। তাঁহার 'পদাবলী'তে বড়ুয়া শব্দের উল্লেখ আছেঃ

"একে তুমি কুলনারী, কুল আছে তোমার বৈরী;
আর তাহে বড়ুয়ার বধূ।"

-পদাবলী, ৩১ পৃঃ

জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস কৃত অভিধান-এ অর্থ লিখিত হইয়াছেঃ "বড়ুয়া = (বোড়ুআ) বি বটু, ব্রাহ্মণ-কুমার, যুবক, ব্রাহ্মণ।" 'শব্দবোধ অভিধান' বলেঃ "বড়ুয়া-(১) আসাম প্রদেশবাসী ব্রাহ্মণদের উপাধি বিশেষ, দেশজ। (২) মহান, অর্থশালী।" আসাম প্রদেশে বৈদ্য বড়ুয়া, কায়স্থ বড়ুয়ারূপে বিভিন্ন বড়ুয়ার সন্ধান পাওয়া যায়। 'চন্দ্রকান্ত অভিধান'-এ আছেঃ "বড়ুয়া = (অং-বর=প্রধান) বি, অহোম রাজার দিনত কোন এক খেলর প্রধান বিষয়া; এই বিলাক বিষয়ার প্রধান কাম আছিল শোধশোধা আরু দেশর শান্তিরক্ষা করা।" গৌহাটির বড়ু য়ারা সিংহ রাজার বংশধর।

ত্রিপুরার রাজাদের ইতিহাস 'রাজমালা'-তে বড়ুয়া জাতির উল্লেখ আছে। "সেকালে পার্বত্যপ্রধানগণ তাঁহাদের অধীনস্থ প্রজাগণের নায়করূপে নির্বাচিত হইতেন এবং তাঁহাদিগকে সর্দার, হাজারী ও বড়ুয়া উপাধিতে ভূষিত করিতেন।

বিজয়মাণিক্য রাজার জমিদার আমি,
সে রাজার বড়ুয়া হৈয়া রাজা হৈলা তুমি।"

- রাজমালা, ১২০ পৃঃ

সেনাপতির নানাবিধ উপাধির মধ্যে বড়ুয়া উপাধিও প্রচলিত ছিল। মহারাজ

অমরমাণিক্য প্রথমে বড়ুয়াপদে নিযুক্ত ছিলেন, পরে রাজত্বলাভ করেন।
প্রতিবেশী চাক্‌মা জাতির সহিত বড়ুয়া জাতির সম্পর্ক যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। চাক্‌মা সমাজে বড়ুয়া গোজা ও রণপাগলা গোষ্ঠী বিদ্যমান। বর্তমানে ইহারা চাক্‌মা জাতিতে পরিণত হইতেছে। রোয়াজা, দেওয়ান প্রভৃতি চাক্‌মা গোষ্ঠী বড়ুয়া সমাজে মিশিয়া গিয়াছে। 'চাক্‌মা জাতির ইতিহাস'-এ আছে ঃ "রাজা থৈন সুরেশ্বরীর (১৪১৯-৭০) রণপাগলা নামে একজন বুদ্ধ-বিশারদ সেনাপতি ছিল। রণপাগলার বংশধরেরা এখনো বড়ুয়া গোজায় আছে।"
-৩১ পৃঃ

"রাজা থৈন সুরেশ্বরী তাঁহার একমাত্র পুত্র জনুকে (মগেরা বলে চনুই) রাজ্যভার অর্পণ করিয়া অমরধামে প্রস্থান করেন। রাজা জনু কিছুকাল স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিবার পর বহু সৈন্য লইয়া মগরাজা চট্টগ্রাম দখল করেন। চাক্‌মা রাজা তাঁহাকে দুইটি হস্তী ও অন্যান্য দ্রব্য উপঢৌকন প্রদান করিয়া তুষ্ট করেন। চাক্‌মারাজ জনুর দুইটি কন্যা ছিল। ...কনিষ্ঠা কন্যা সাজেম্বীর সহিত পরে (১৫১৯) মগরাজার বিবাহ হইয়াছিল। ....মগরাজা চাক্‌মা রাজাকে পূর্বাপেক্ষা বহু ক্ষমতা প্রদান করিয়া 'কোংলাপ্রু' (সদাশয়) খেতাব প্রদান করেন। চাক্‌মারাজ জনুর জ্যেষ্ঠা কন্যা রাজেম্বীর সহিত বুড়া বড়ুয়া নামক রাজার প্রধান সেনাপতির বিবাহ হয়।

....মগরাজার অনুগ্রহে চাক্‌মা রাজা জনু প্রধান সেনাপতি জামাতা বুড়া বড়ুয়ার সহায়তায় অতিশয় প্রতাপান্বিত হইয়া উঠেন। চাক্‌মারাজ জনুর মৃত্যু হইলে দৌহিত্র-সূত্রে বুড়া বড়ুয়া রাজ্যভার প্রাপ্ত হইলেন। রাজপুরী রক্ষার জন্য বুড়া বড়ুয়া কতিপয় সুশিক্ষিত সৈন্যদলের সৃষ্টি করিলেন। উক্ত সৈন্যদলের সেনাপতির নাম পাগলা বড়ুয়া। এই পাগলা বড়ুয়ার বংশধরেরা পরে 'বড়ুয়া গোজার' সৃষ্টি করে। রাজা বুড়া বড়ুয়ার পুত্র সাতুয়া বড়ুয়া। সাতুয়া বড়ুয়া পরে পাগলা রাজা নামে আখ্যাত হন। ... পাগলা রাজার মহিষীকে রাজ্যভার দেওয়া হইল। রাণী দক্ষতা সহকারে কিয়ৎকাল রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন বলিয়া তাহাকে 'কাটুয়া কন্যার আমল' বলিয়া থাকে।

পাগলা রাজার দুই পুত্র চন্দন খাঁ ও রতন খাঁ; কন্যার নাম অমঙ্গলী। রাজকন্যা অমঙ্গলীর রাজঅমাত্য-পুত্র মুলিমা থংজার বিবাহ হয়।....

পাগলা রাজার মহিষী লোকান্তর গমন করিলে রাজকুমার যুগল- চন্দন খাঁ ও রতন খাঁ- ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করিবার পর পরলোকগমন করেন। তাঁহাদের কোনও সন্তান না থাকায়... অমঙ্গলীর পুত্র ধাবনাই রাজসিংহাসন লাভ করেন।"

[পাদটীকা ঃ] রাজনামায় এই সময় হইতে বড়ুয়া শব্দ পাওয়া যায়। ... বুড়া বড়ুয়া, সাতুয়া বড়ুয়া, পাগলা বড়ুয়া, বড়ুয়া গোজা ইত্যাদি শব্দে বড়ুয়া জাতির সহিত চাক্‌মা জাতির একটা সম্বন্ধ আছে, তাহা মনে হয়। চাক্‌মা রাজসরকারে প্রাচীনকাল হইতে বড়ুয়া জাতি চাকুরী করিয়া আসিতেছে।]

-চাক্‌মা জাতির ইতিহাস, ৩২ পৃঃ

এইরূপে বড়ুয়া গোজার হাত হইতে চাক্‌মা সিংহাসন মুলিমা গোজার হাতে আসে। এইবংশের দ্বাদশজন রাজরাণী ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রাজ্যশাসন করেন। তৎপর রাজা হরিশচন্দ্র রায় হইতে বর্তমান রাজা পর্যন্ত বংজা গোজার রাজত্ব চলিতেছে।

বড়ুয়া ও চাক্‌মা জাতির মূল উৎস বৈশালীর বর্জি ও কপিলবাস্তুর শাক্যজাতি। অজাতশত্রু ও বিড়ুঢবের আক্রমণে তাহারা বাস্তুহারা হইয়া আসাম হইতে ক্রমশঃ চট্টগ্রাম আসিয়াছে। মতান্তরে, ত্রয়োদশ শতকে মোগলদের আক্রমণে মগধ হইতে অনেকে সোজা চট্টগ্রাম আসিয়াছে। শেষাগতদের অনেকে সিং বা সিংহ উপাধিধারণ করিতেন- যেমন নারায়ণ সিং সুবাদার, লক্ষ্মণ সিং জমাদার, মোহন সিং সুবাদার প্রভৃতি। নোয়াখালী ও ত্রিপুরার বৌদ্ধগণ সিংহ উপাধি ব্যবহার করেন। বড়ুয়া ও চাক্‌মা জাতির মধ্যে সাংস্কৃতিক সম্বন্ধ ছাড়াও বহুবার রক্তের সম্পর্ক ঘটিয়াছে। একের অংশবিশেষ অপরে মিশিয়া গিয়াছে। নানা ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যেও উভয় জাতি পাশাপাশি বাস করিয়াছে। লেখকের গ্রামের প্রাচীনতম পুষ্করিণী 'চাক্‌মা পুকুর'। এই জাতীয় নিদর্শন অন্যত্রও বিরল নহে। ১৮৬০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম স্বতন্ত্র ও সংরক্ষিত জেলা হওয়ায় সহজ-জীবিকার জন্য চাকমারা তথায় চলিয়া যায়। যাহারা জমি-জমার মায়া ছাড়িতে পারে নাই তাহারা বড়ুয়া হইয়া গিয়াছে। তখন হইতেই বড়ুয়া ও চাক্‌মার মধ্যে ভৌগোলিক দূরত্বের সূচনা হয়। অন্যথা চিরকাল তাহারা একই সংস্কৃতির ধারক-বাহক। সুতরাং চাক্‌মা বলিয়া শুকদেব রায়কে দূরে রাখা চলে না। বড়ুয়াবংশ হইতে শুকদেবের বংশে রাজত্ব আসিয়াছে।

চট্টগ্রামের ধর্ম

চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম কোন সময়ে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। সম্রাট অশোকের সময় নিম্ন-ব্রহ্মে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়। প্রচারকেরা জলপথে কিংবা স্থলপথে যাইবার সময় চট্টগ্রামে এই ধর্ম প্রচারিত হওয়া সম্ভব।

ঐতিহাসিক পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী বলেন ঃ "খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে মগধদেশ হইতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারকগণ পূর্বদেশে আসিয়া ধর্মপ্রচার করেন।" [-চট্টগ্রামের ইতিহাস, ১৩ পৃঃ] সুতরাং বৌদ্ধধর্মই চট্টগ্রামের প্রাচীনতম ধর্ম।

"চৈনিক পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ্ [৬২১-৬৪৫] আপন ভ্রমণ- বৃত্তান্তে শ্রীচট্টল সমতটের পূর্ব-দক্ষিণ দিকে অবস্থিত বহু সংখ্যক চৈত্যবিশিষ্ট পার্বত্যস্থান বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।" [-বড়ুয়া জাতি, ৫ পৃঃ] পণ্ডিতেরা বলেনঃ "ত্রিপুরার দক্ষিণে, আরাকানের উত্তরে রম্মদেশ অবস্থিত। উহার রাজধানী ছিল শ্রীচট্টল।" [-গোবিন্দ চন্দ্র গীত] ইহা চট্টগ্রাম সহরের প্রাচীন নাম। তথায় 'পণ্ডিত বিহার' নামে এক বৌদ্ধ-শিক্ষাকেন্দ্র ছিল। "নবম শতাব্দীতে চট্টগ্রাম বৌদ্ধধর্ম-চর্চার অন্যতম কেন্দ্র হইয়া উঠে। ...এই সময় চট্টগ্রামকে রম্মা, রম্যভূমি ও পণ্ডিত বিহার নামে উল্লেখ করা হইয়াছে। সম্ভবতঃ পণ্ডিত বিহার নামক বৌদ্ধ বিহার বা সংঘারামের নামানুসারেই সমগ্র স্থানকে নির্দেশ করা হইয়াছে। ... বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতগণ এই বিহারে মিলিত হইতেন। ...দশম শতাব্দীর মধ্যভাগে আচার্য প্রজ্ঞাভদ্র (তিলোপা) পণ্ডিত বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি চট্টগ্রামবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের পুত্র। ... প্রজ্ঞাভদ্র পণ্ডিত বিহারে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন। ...অসংখ্য দেবদেবীর কল্পনা, তাঁহাদের পূজা, উহার জন্য মণ্ডল আঁকা, স্তব-স্তোত্র, মন্ত্র, টীকা-টিপ্পনি সমেত পুস্তক রচনা করা তান্ত্রিক বৌদ্ধ-পণ্ডিতদের কাজ ছিল। প্রজ্ঞাভদ্র নিজে বিকৃত (বৌদ্ধ) সংস্কৃত ভাষায় 'শ্রীসহজ সম্বরাধিষ্ঠান', 'অচিন্তা-মহামুদ্রানাম', 'চত্তু-চতুরোপদেশ', 'প্রসন্নদীপ', 'মহামুদ্রোপদেশ', দোহাকোষ এবং 'ষড়ধর্মোপদেশ' নামে কয়েকখানি পুস্তক রচনা করেন।

নাড়পাদ (নারোপা) প্রজ্ঞাভদ্রেব প্রধানশিষ্য ছিলেন। তিনি 'ষড়ধর্মোপদেশ' পালিভাষায় অনুবাদ করেন। বলিরত্ন প্রভৃতি বহু বৌদ্ধ-পণ্ডিত পণ্ডিত বিহার হইতে এইসময় বৌদ্ধধর্ম প্রচার করিতে তিব্বত গমন করিয়াছিলেন। এই বিহারের সহিত যাঁহাদের স্মৃতি বিজড়িত তন্মধ্যে নাড়পাদ, লুইপাদ, অনঙ্গবজ্র, তঘন, সবরিপাদ, অবধূতপাদ, নানাবোধ, জ্ঞানবজ্র, বুদ্ধজ্ঞানপাদ, অমোঘনাথ ও ধর্মশ্রী-মৈত্র প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইহাদের কেহ কেহ চট্টগ্রামবাসী ছিলেন।"

-চট্টগ্রামের ইতিহাস, ২৭-২৯ পৃষ্ঠা

ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, এই সকল অঞ্চলের শাসনভার বৌদ্ধদের হাত হইতে সোজা মুসলমানের হাতে যায়। সেনবংশের পূর্বেও পরে বাঙালায় বহুকাল হিন্দুরাজত্ব ছিল না। বরঞ্চ ঐবংশের রাজা মধু সেন পরম সৌগত ছিলেন।

চন্দ্রবংশের রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন। ইতিহাস বলেঃ "১২২৯ খৃষ্টাব্দে চন্দ্রবংশীয় দেবগণ চট্টগ্রামে স্বাধীনতা অবলম্বন করিয়াছেন। পুরুষোত্তম দেব, মধুসুদন দেব, বাসুদেব, দামোদর দেব ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন। ১২৪৩ খৃঃ দামোদর দেব ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করেন। দামোদরের বংশধর হইতে ত্রিপুরারাজ রত্নফা [১২৭৯ খৃঃ] চট্টগ্রাম অধিকার কলিয়া লন।" [-চঃ ইঃ, ৩৪ পৃঃ] এই দেবগণের বাসস্থান দেবগ্রাম দেবাং-এ পরিণত হইয়াছে। চট্টগ্রাম সহরের দেবপাহাড় তাঁহাদের স্মৃতি বহন করে। পঞ্চদশ শতকের শেষভাগে রাজা জয়চাঁদ চক্রশালায় আরাকানের প্রতিনিধি ছিলেন। বৌদ্ধনৃপতিদের সহায়তায় দেবাং, চক্রশালা, রামু এবং অন্যত্রও বহু বিহার প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

বক্তিয়ার খিলজির আক্রমণে যে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস হইয়াছিল তাহা সমস্ত ঐতিহাসিকের স্বীকৃত সত্য। প্রসিদ্ধ মুসলমান লেখক মিন-হাজ উস্-সিরাজী কৃত 'তবকৎ-ই-নাসিরী'-তে চিত্তাকর্ষক বর্ণনা আছেঃ 'মহম্মদ বক্তিয়ার সেইস্থানের বর্হিদ্বারে উপস্থিত হইলেন। তাঁহারা দুর্গটি দখল করিলেন এবং বহু মূল্যবান সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন। ঐ স্থানের বাসিন্দা অধিকাংশই মুণ্ডিতকেশ-ব্রাহ্মণ। তাঁহাদের সকলকে হত্যা করা হইয়াছিল। সেখানে বহু সংখ্যক পুস্তক পাওয়া গেল। পুস্তকের মর্ম কি জানিবার জন্য অনেক হিন্দুকে ডাকিতে পাঠান হইল। কিন্তু সমস্ত হিন্দুকে বধ করা হইয়াছিল। পরে জানা গেল, সমস্ত দুর্গ ও নগর কলেজ ছিল। হিন্দীভাষায় ইহাকে কলেজ বিহার বলা হইত।

-৫০০ পৃষ্ঠা

এ স্থলে ভিক্ষুগণকে ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধগণকে হিন্দু, বিহারকে সৈন্যের দুর্গ এবং ভিক্ষুদিগকে সৈন্য মনে করা হইয়াছিল, ইহাই ভাবার্থ।"

-বড়ুয়া জাতি, ৩ পৃঃ

নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংসের পর দেবরাজগণের সময় চট্টগ্রামের পণ্ডিত বিহার বৌদ্ধধর্ম-চর্চার প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠে। ইহার উন্নতি কয়েক শতক অক্ষুণ্ন থাকে। ত্রয়োদশ শতকের আরব্ধ ধ্বংসলীলা ক্রমে ওদন্তপুর, বিক্রমশীলা, সোমপুর, জগদ্দল, কণকস্তূপ প্রভৃতি বিহার ভস্মীভূত করিয়া সপ্তদশ শতকের অপরার্ধে পণ্ডিত বিহারে আসিয়া পৌছে।

আরাকানের রাজারা দুই শতকের অধিককাল চট্টগ্রাম শাসন করেন। এইসময় দেশ খুব শান্তিতে ছিল না। আরাকানের রাজা, ত্রিপুরার অধিপতি, চাক্‌মা রাজা ও মুসলমানগণের দ্বারা চট্টগ্রামের উপর বহু যুদ্ধবিগ্রহ হইয়াছে। ১৫০১ খৃষ্টাব্দে ত্রিপুরার মহারাজ ধন্যমাণিক্য (১৪৯০-১৪১৭) স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া চট্টগ্রাম

আক্রমণ করেন এবং মগধেশ্বরীকে নিয়া উদয়পুরে 'ত্রিপুরাসুন্দরী' নামে প্রতিষ্ঠা করেনঃ

"চট্টগ্রাম সদরঘাট এক বৃক্ষমূলে,
পূজয়ে আমাকে সদা মগধ সকলে।
সেইস্থান হইতে শীঘ্র আনহ আমায়।"

-রাজমালা, ১২৬ পৃষ্ঠা

ত্রিপুরার রাজারা তখনও তান্ত্রিক-বৌদ্ধ ছিলেন। তান্ত্রিক কালীপূজার জন্য বৌদ্ধদের মধ্যে এই সংগ্রাম। তৎপর-"ত্রিপুরা রাজবংশের অমর মাণিক্যের পুত্র রাজধর মাণিক্য (১৬১১-২৩) সর্বপ্রথম গোড়ীয় বৈষ্ণবধমে দীক্ষা গ্রহণ করেন।" -রাজমালা, ২ ॥ পৃষ্ঠা

ইহার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ ১৬৩১ খৃষ্টাব্দে মুকুট রায়ের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বৌদ্ধেরা তাঁহাদের মগধেশ্বরী দেবীকে পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করেন। "রাজমালার কল্যাণমাণিক্য খণ্ডে পাওয়া যায়ঃ

কালিকার মঠচূড়া মঘে ভাঙ্গি ছিল,
পুনর্বার মহারাজ নির্মাণ করিল।

এই ঘটনার পঞ্চাশ বৎসর পরে ১৬৮১ খৃষ্টাব্দে মহারাজ রাম মাণিক্য মন্দির সংস্কার করিয়াছিলেন।"

-রবিবাসরীয় আনন্দবাজার, ২৩।২।৬৪ ইং

আরাকান রাজত্বের সময় বাঙালি বৌদ্ধেরা তান্ত্রিক-বৌদ্ধ ছিলেন। তাঁহাদের তান্ত্রিক-দেবতা মগধেশ্বরীর প্রভাব আরাকানের রাজধানী মিহং বা পাথরকিল্লাতেও উজ্জ্বল ছিল।

"১৬৩৮ খৃঃ আরাকানরাজের দুর্ব্যবহারে সামন্ত-নৃপতি মুকুট রায় অসন্তুষ্ট হইয়া মোগল সম্রাটের প্রাধান্য স্বীকার করেন। কিন্তু নির্ধারিত রাজস্ব আদায় দিতে অস্বীকৃত হইলেন এবং স্বাধীনতা অক্ষুণ্ন রাখিলেন।"

-মাতৃপূজায় মানবধর্ম

১৬৬৬ সালের ২৭শে জানুয়ারী, চট্টগ্রাম মোগলশাসনের অন্তর্গত হয়। দক্ষিণ অংশে-কর্ণফুলী ও রামুতে-আরাকানরাজ চন্দ্র সুধর্মার রাজত্ব চলিতে থাকে। ঐ শতাব্দীতেই সমগ্র দেশ মোগলের অধিকারে আসে। ঐতিহাসিকেরা বলেনঃ "বুজুর্গ উমেদখাঁর জয়ের অন্যতম ফল হইল যে, ভারত আদৌ (Proper) হইতে বৌদ্ধরাজত্বের উচ্ছেদ হইয়া গেল। যাহা হউক, বৌদ্ধধর্ম ভারত হইতে নির্বাসিত হইয়াও চট্টগ্রামে তাহার অবশেষ রাখিয়া যায়।"

- চট্টগ্রামের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, ১২ পৃঃ

ইতিহাস অকপটে স্বীকার করিয়াছে যে, "মুসলমান অধিকারের সাক্ষাৎফল-স্বরূপ চট্টগ্রামে তান্ত্রিক-বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হ্রাস পাইতে থাকে থাকে এবং পণ্ডিত বিহার ক্রমশঃ অধঃপতিত হইয়া নিশ্চিহ্ন হইয়া যায়।"

-চট্টগ্রামের ইতিহাস, ৩৬ পৃঃ

এইসময় পণ্ডিত বিহার সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস হয়। এই বিহারে বহু শতাব্দীব্যাপী তান্ত্রিক-ধর্মের গবেষণা চলিয়াছে। বহু পণ্ডিত অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। পুস্তকালয়ে বিরাট পুঁথির সংগ্রহ ছিল। নালন্দাদির ন্যায় সমস্তই ভস্মীভূত হইল। ঐতিহাসিকদের ধারণা রংমহল পাহাড় ও জুম্মামসজিদের সংলগ্ন অঞ্চলেই পণ্ডিত বিহার ছিল। জেনারেল হসপিটাল নির্মাণের সময় তথায় প্রাপ্ত বুদ্ধমূর্তি চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারে প্রতিষ্ঠিত আছে। তথায় খনন করিলে উহার ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হইতে পারে। অতঃপর তান্ত্রিকধর্ম চর্চার কেন্দ্র ও গ্রন্থরাজি বিনষ্ট হইল। বাঙালি বৌদ্ধদের নিকট কোন ধর্মগ্রন্থই আর রহিল না। তাহারা ইতস্ততঃ বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। শতাব্দীকাল ইসলাম রাজত্বে থাকিয়া বৌদ্ধদের বিরাট অংশ রাজকীয়-ধর্ম গ্রহণ করিল।

পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে 'বুদের মকান' নামে এক প্রকার উপাসনালয় আছে। সেই সমুদরে মসজিদের সকল চিহ্ন নাই। পণ্ডিত আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ প্রভৃতি মনীষীবৃন্দ মনে করেন যে, ঐগুলি বুদ্ধের বিহার ছিল। স্থানীয় বৌদ্ধদের ইসলামধর্ম গ্রহণের পর মূর্তিগুলি অপসারিত হইয়াছে এবং তথায় তাঁহারা উপাসনা সুরু করিয়াছেন। স্বাধীনতার পর পশ্চিম পাকিস্তানে বহু 'গুরুদ্বার' মসজিদ-এ পরিণত হইয়াছে। কয়েকটি প্রাচীন জমিদার ও তালুকদার বংশ বৌদ্ধ ও মুসলমানের মধ্যে দেখা যায়, কিছুকাল পূর্বেও তাঁহাদের মধ্যে সম্পর্কের পরিচয় ছিল।

বহু সংখ্যক বৌদ্ধ বৈষ্ণবধর্মের মাধ্যমে হিন্দুতে পরিণত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণকে পুরোহিত স্বীকার করিলেই বৌদ্ধেরা হিন্দু হইতে পারিতেন। জয় দুর্গা, হরি শরণ, নমো গণেশায়, কালীপূজা, দুর্গা পূজা প্রভৃতি উভয় ধর্মাবলম্বীর মধ্যে সমানই ছিল। বৌদ্ধ বিহারগুলি ধ্বংসের সঙ্গে ধর্মগুরুর অভাব হওয়ায় কাণ্ডারীবিহীন সমাজ ব্রাহ্মণের পৌরোহিত্য স্বীকারে বাধ্য হয়। সাহা, বণিক, নাথ প্রভৃতি অনেক সম্প্রদায় কয়েক পুরুষ পূর্বেও বৌদ্ধ ছিলেন। রায়বংশের উজ্জ্বল ভাস্কর কবি ˜ নবীন চন্দ্র সেন তাঁহার 'আমার জীবন'-এ বংশ-পরিচয় দিয়াছেনঃ "কুলজীর শীর্ষস্থানীয় নাম- বৌদ্ধসেন।" [-৪ পৃঃ] এই বংশের শাখা

হিন্দু, বৌদ্ধ ও মুসলমানদের মধ্যেও দেখা যায়। থেরবাদ গ্রহণের পর বৌদ্ধেরা হিন্দুদের হইতে দূরে সরিয়া পড়িলেন।

পণ্ডিতেরা বলেনঃ "আধুনিক হিন্দুগণের পূর্বপুরুষগণই অনেকে বৌদ্ধধর্মালম্বী ছিলেন, কিন্তু বিশ্বাস ও ধর্মভেদ হেতু তাঁহারা (বৌদ্ধেরা) আমাদিগের সহানুভূতি ও ধর্ম-সংস্কার হইতে– চীন ও জাপানবাসীদের ন্যায়– সম্পূর্ণ দূরবর্তী হইয়া রহিয়াছেন।"

-বঙ্গভাষা ও সাহিত্য, ৭১ পৃঃ

ইংরেজ-রাজত্বে কিছু সংখ্যক বৌদ্ধ আর্থিক সুবিধার জন্য খৃষ্টান হইয়াছেন। তাহাদের সহিত বৌদ্ধদের সম্বন্ধ রহিয়াছে। কিছু ফেরাঙ্গীর গোষ্ঠী বৌদ্ধদের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।

যাহারা ধর্মান্তর গ্রহণ করে নাই তাহারা রাউলী পুরোহিত নিয়া কোন মতে আত্মরক্ষা করিয়াছে। এই সময়ের বড়ুয়া ও চাক্‌মা সমাজে প্রাপ্ত 'মঘা খন্মৌজা' ও 'গোজেন লামা' প্রভৃতিতে কৃত্রিম ও মনগড়া ধর্মই বুদ্ধের নামে চলিয়াছিল, তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে। বৌদ্ধধর্মের প্রায় অন্তিম মুহূর্তে চট্টগ্রাম তথা ভারতে সংঘরাজ সারমেধ ইহার সংস্কার করিলেন, থেরবাদ-শিখা সংযোগে পুনরায় ইহাকে প্রজ্বলিত করিলেন। তদবধি সদ্ধর্মের পুনরুত্থান সম্ভব হইয়াছে।

উপসম্পদার বয়স

বুদ্ধত্বলাভের বিশ বৎসর পর- রাজগৃহে সপ্তদশজন বালক পরস্পর বন্ধুতাসূত্রে আবদ্ধ ছিল। উপালি তাহাদের মধ্যে প্রধান। উপালির মাতা-পিতার মনে হইলঃ "কোন্ উপায়ে আমাদের অবর্তমানে উপালি সুখে থাকিবে এবং কোন ক্লেশ পাইবে না।...যদি উপালি লিপি, গণনা ও রূপ শিক্ষা করে তবে তাহার কষ্ট হইবে।...যদি উপালি প্রব্রজিত হয়- তবে সুখে থাকিবে...।"

উপালি মাতা-পিতার আলোচনা শুনিয়া বন্ধুদিগকে বলিলঃ "আর্যগণ! চল, আমরা শাক্যপুত্রীয় শ্রমণদের নিকট প্রব্রজিত হই।" বন্ধুরা সম্মত হইল। তাহারা ভিক্ষুদের নিকট গেলে ভিক্ষুরা তাহাদিগকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা দান করিলেন। তাহারা প্রত্যুষে শয্যাত্যাগ করিয়া রোদন করিতে লাগিল ঃ "ভাত দাও, যাগু দাও, খাদ্য দাও।"

ইহা শুনিয়া বুদ্ধ কহিলেন ঃ "হে ভিক্ষুগণ! সত্যই কি ভিক্ষুরা জ্ঞাতসারে বিংশতি বৎসরের কম বয়স্ক ব্যক্তিকে উপসম্পদা দিতেছে?" "হাঁ, ভগবন!"

ভগবান বুদ্ধ বলিলেনঃ "ভিক্ষুগণ! কমবয়স্ক ব্যক্তি শীত-উষ্ণ, ক্ষুধা-তৃষ্ণা, দংশ, মশক, বাতাতপ, সরীসৃপ-সংস্পর্শ, দুরুক্ত বাক্য, দুঃখপ্রদ তীব্র শারীরিক বেদনা সহ্য করিতে পারে না।" —মহাবর্গ, ৮৩ পৃষ্ঠা

এই উপলক্ষে ভগবান প্রাতিমোক্ষে শিক্ষাপদ প্রজ্ঞাপ্ত করিলেন যে, "বিশ বৎসরের কম বয়স্ককে উপসম্পদা দিলে সে অনুপসম্পন্ন থাকিবে এবং উপসম্পদাদাতাদের 'পাচিত্তিয়' ও 'দুক্কট' অপরাধ হইবে।"

-৬৫তম শিক্ষাপদ

এই ঘটনাকে উমেশবাবু বলেন ঃ "সিদ্ধার্থের পুত্র কোমলমতি রাহুলকে ভিক্ষুত্বে দীক্ষা দিলে আপত্তি উত্থাপিত হওয়ায় বুদ্ধ সেই হইতে নিয়ম করিলেন- কম বয়স্ককে ভিক্ষুত্বে দীক্ষা দিবে না।"

-শেষ বক্তব্য, ৪ পৃঃ

গৃহীদের কল্পিত বিনয় আলোচনা মাসীর কাছে মাতুলালয়ের গল্পের মতই শোনায়!

শীলভদ্রের দোহাই

মুচ্ছদ্দীবাবু বলিয়াছেন ঃ "নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শীলভদ্র, বিক্রমশীলার অধ্যক্ষ দীপঙ্করশ্রীজ্ঞান প্রভৃতি মহারথিগণ কি ভিক্ষুত্বে দীক্ষা দিবার বয়স জানিতেন না?" - শেষ বক্তব্য, ৪ পৃঃ

ঐ সকল মহারথিগণ দ্বাদশ শতাব্দীর পূর্বে জীবিত ছিলেন। তৎপর ঐ সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও ধর্মগ্রন্থাদি ভস্মীভূত হয়। সেই ধ্বংসলীলার বহু পরের- উনবিংশ শতকের কথাই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

১৯২১ খৃষ্টাব্দে সাহিত্য পরিষদের সভাপতির ভাষণে আছেঃ "ভিক্ষুদীক্ষা ৫ বৎসরে ও বজ্রাচার্যদীক্ষা ১৬ বৎসর বয়সে গ্রহণের প্রথা নেপালের বজ্রযান-এ এখনও প্রচলিত। [-হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী, ৪৫০ পৃঃ] উমেশবাবু তাহা স্বীকার করেন না।

লামা শ্রীঅংগরূপ লাহুলী (রাউলী?) মহাশয় 'লামাদের প্রব্রজ্যা সংস্কার'-এ লিখিয়াছেন ঃ "আধুনিক বৌদ্ধধর্ম প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত। উহা স্থবিরবাদ ও মহাযানপন্থী। ...এখানে আমি ভিক্ষু ও লামাদের নামে সম্বোধন করিতেছি। কেননা ভারতে উভয় নামে বৌদ্ধধর্মগুরুকেই বুঝায়।...লামাদীক্ষা যে কোন অবস্থায় হইতে পারে। কিন্তু ভিক্ষুর জন্য কমপক্ষে বিশ বৎসর বয়স পূর্ণ হওয়া

প্রয়োজন। ইহাতে ভিক্ষু ও লামার পার্থক্য প্রকট হইয়া পড়ে। ...লামাগণ ভিক্ষুকে পূজনীয় মনে করেন।...ভিক্ষু, হইবার জন্য লামাকে ভিক্ষুদীক্ষা বা উপসম্পদা লইতে হয়।" -ধর্মদূত, মার্চ, ১৯৫২

এই নেপালী লামার উক্তি মুচ্ছদ্দীবাবু অস্বীকার করিবেন কি? চট্টগ্রামে এই মহাযান বা বজ্রযানপন্থী রাউলীদের দীক্ষা যে বিশ বৎসরের পূর্বে হইত তাহার প্রমাণ কেবল শ্রদ্ধেয় রামধন মাথে নহেন - আচার্য চন্দ্রমোহনও প্রথমে ১৬ বৎসর বয়সে- উপসম্পন্ন হইয়াছিলেন। তাঁহার গুরু মোহন মাথে, পিতৃব্য সুদন মাথে আরো অনেকেই এইরূপে দীক্ষিত। তখনকার রাউলীদের দীক্ষার বয়সের সীমা নির্দিষ্ট ছিল না। এখনও নাই। সুতরাং শীলভদ্র, দীপঙ্করের দোহাই এক্ষেত্রে অচল।

তিনি লিখিয়াছেন ঃ "দর্শনের ব্যাখ্যা আর বোধিসত্ত্ববাদ ব্যতীত ত্রিপিটকের অন্যান্য অংশে কোন পার্থক্য নাই।" [- শেষ বক্তব্য, ৫ পৃঃ] ইহার কয়েক লাইন পরে লিখিয়াছেনঃ 'নেপাল, তিব্বত, উত্তর চীন ও মঙ্গোলিয়ায় দুই শ্রেণীর লামা আছেন, গৃহীলামা এবং ভিক্ষুলামা"। [-ঐ, ৬ পৃঃ] থেরবাদ ত্রিপিটকে কি কোথাও গৃহী ভিক্ষুর অনুমোদন আছে? সম্রাট কণিষ্কের সময়ে থেরবাদ ও সর্বাস্তিবাদ ত্রিপিটকের মধ্যে সামঞ্জস্য ছিল। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকের রাউলীদের থেরবাদ কিংবা মহাযান কোন ত্রিপিটকই ছিল না। কতকগুলি বিবাহিত পুরোহিতের মনগড়া ধর্মই বৌদ্ধধর্ম নামে চলিয়াছিল। তিনি লিখিয়াছেন ঃ "অশোকের সময় মহাযানী ভিক্ষু ছিলেন।" [ঐ, ৬ পৃঃ] উহা ভুল, অনৈতিহাসিক উক্তি। ইহার প্রায় ছয়শ বৎসর পরে মহাযানের উৎপত্তি হয়। প্রথম পরিচ্ছেদে তাহা বর্ণিত হইয়াছে।

তিনি আবেদনে বলিয়াছেনঃ "দ্বাদশ, ত্রয়োদশ, চতুদর্শ শতাব্দীতে - ইসলাম রাজত্বের সময়-বৌদ্ধগণ বজ্রযানী, সহজযানী প্রভৃতি ছিলেন। [ঐ, ৭ পৃঃ] এই ইসলাম রাজত্ব চট্টগ্রামে ১৭৬০ খৃঃ পর্যন্ত চলিয়াছে। এই সময় বজ্রযান ও সহজযানের রাউলী সম্প্রদায় থেরবাদ উপসম্পদা গ্রহণের কোন নিদর্শন নাই। বরং বৌদ্ধেরা দলে দলে রাজধর্ম গ্রহণ করিয়াছেন। চট্টগ্রামের মুসলমানদের মধ্যে এক বিভেদ বহু দিন যাবৎ চলিয়াছে ঃ "খাস চট্টগ্রামীরা অপরদেরে দাঁদাঁরিয়া বলিয়া এবং অপরেরা চট্টগ্রামীদের 'মগ' বলিয়া গালি দিত।" - চট্টগ্রামের ইতিহাস, ২য় ভাগ, ৩৭ পৃঃ

মগধ হইতে যে সময় বৌদ্ধেরা ইতস্ততঃ পলায়ন করেন তখন তথায় উত্তরমূলীয় বা থেরবাদ সম্প্রদায় ছিল না। অশোকের সময় বাংলাদেশে ও নিম্ন-ব্রহ্মে

থেরবাদ-ধর্ম প্রচারিত হইলেও কণিষ্কের পরে উহা নিষ্প্রভ হয় এবং বঙ্গদেশ ও উত্তর-ব্রহ্মে তান্ত্রিক-বৌদ্ধধর্ম প্রবল হয়। রাজা অনিরুদ্ধের (১০৫৭) সময়ে উত্তর-ব্রহ্মে ও আকিয়াবে থেরবাদ-ধর্ম প্রচারিত হয়। উহারই প্রবাহ বহু শতাব্দী পরে চট্টগ্রাম আসিয়া পৌছে। চট্টগ্রামের ঊনবিংশ শতাব্দীর রাউলী পুরোহিতগণ উত্তর মূলনিকায়, শোন-উত্তর কিংবা নাগার্জুন-দীপঙ্করের বংশধর ছিলেন না। তাঁহারা বৌদ্ধধর্মের শেষ পর্যায়ের নিদর্শন। আউল, বাউল সম্প্রদায়গুলি ক্রমশ: বৈষ্ণব ও শৈব সম্প্রদায়ের হিন্দুতে পরিণত হইয়াছে। রাউলেরা বৌদ্ধসমাজের পৌরোহিত্য করিতেন। তাঁহারা মহাযান বা থেরবাদ কোন ধর্মই জানিতেন না। এই সময়ের অবস্থা "সদ্ধর্ম রত্নাকর"-এ বর্ণিত হইয়াছে ঃ "এইরূপে বৌদ্ধধর্মের সারতত্ত্ব আগাগোড়া কিছুই বুঝিতে না পারিয়া খৃষ্টীয় সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে বড়ুয়া-বৌদ্ধদের মধ্যে অনেকে পারিপার্শ্বিক হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের কৌশলী ধর্মযাজকগণ বড়ুয়া পাড়ায় দুর্গাপূজা, মনসাপূজা, শীতলাপূজা ইত্যাদি কিছু কিছু সুরু করিয়া দিলেন। ইহার ফলে বড়ুয়া-বৌদ্ধগণ-না-হিন্দু, না-বৌদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন।"

- ৪৪২ পৃঃ

এই সকল তান্ত্রিক পূজা-পদ্ধতি সহজিয়া বৌদ্ধদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। রাউলীদের হাত হইতে পৌরোহিত্যের ভার ক্রমশঃ ব্রাহ্মণেরা অধিকার করিতেছিলেন। বৌদ্ধকে হিন্দু করিবার ইহা প্রধান উপায়। রাউলীরা না থাকিলে বাঙালি বৌদ্ধেরা হিন্দু হইয়া যাইতেন। রাউলী পুরোহিতেরা গৃহে থাকিতেন। এখনও চাক্‌মা সমাজের রাউলীরা বিহারে বাস করেন না। তজ্জন্য মহাযানী বিহারগুলি ধ্বংসের পর চট্টগ্রামে তাঁহাদের দ্বারা কোন বিহার গড়িয়া উঠে নাই। আরাকানী থেরবাদী ভিক্ষুদের দ্বারা গ্রামে গ্রামে 'ক্যাং' নির্মিত হইয়াছে। এইবার চক্ষু-কর্ণের বিবাদ ভঞ্জনের জন্য তিনি ১৯২৪ ইংরেজীর ধর্মাঙ্কুর বিহার উৎসর্গের সময় তিন দলের মিলনের অকেজো নজির উদ্ধৃত করিয়াছেন। সত্যই যদি তখন মিলন ঘটিয়া থাকে তবে ১৯২৬ সালে তাঁহার লিখিত 'মাতৃপূজায় মানবধর্ম' গ্রন্থে বিভিন্ন নিকায়ের ইতিবৃত্ত রচিত হইল কেন? ১৯২৮ সালে রামধন স্মৃতি ভাণ্ডারের কার্যবিবরণীতে সংঘরাজ দল, উত্তর ও দক্ষিণ কূল, রামদাস, তিতন ও অভয় মাথের দল পাঁচভাগরহিল কিরূপে? ১৯৩৫ ইংরেজীতে পুনরায় তিনদলের সমিতি হইল কিরূপে? এবং আপনারা এখন মিলনের চেষ্টা করিতেছেন কেন?

এই সকল ঘটনায় প্রমাণিত হইবে যে, ধর্মাঙ্কুর বিহার উৎসর্গের জন্যই

কলিকাতায় উৎসব হইয়াছিল। উপসম্পদা-বিচার, কিংবা দল-মিলানের জন্য নহে। তথায় পারাজিকা-দোষে সসপেণ্ড দণ্ডপ্রাপ্ত ˘ অখিল মাথেও উপস্থিত ছিলেন। কিন্তু সংঘরাজ নিকায়ের তদানীন্তন নায়ক শ্রদ্ধেয় ˘ জ্ঞানালঙ্কার মহাস্থবির তাহাতে যোগদান করেন নাই।

অপব্যাখ্যা

'শেষ বক্তব্য'-এ আছে ঃ "ভন্তে মহাভারতে বিচার ব্যতীত এক নিদান দিয়াছেন- মহাস্থবির সম্প্রদায়ের ভিক্ষুগণকে দল্হী-কর্ম করিতে হইবে...."। [-১২ পৃঃ] মুচ্ছদ্দীবাবু প্রকৃত ঘটনা না জানিয়া ওকালতি লইয়াছেন,– অথবা ঘটনা নিজে রচনা করিয়াছেন। রেঙ্গুনে শ্রীমান বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবিরসহ আমরা যখন ধর্মদূত বিহারে ছিলাম, তখন প্রত্যহ 'রয়েল লেক'-এ প্রাতঃভ্রমণ করিতাম। একদিন আমরা দুইজনেই ভ্রমণে যাই। এই সময় বিশুদ্ধানন্দ তাহার ঢাকার কার্যাবলীর বর্ণনা করে এবং নানা বাধা-বিপত্তির কথা বলে। তন্মধ্যে নিকায়গত বাধাই মুখ্য বলিয়া স্বীকার করে। তখন তাহাকে বলা হয়, সেই নিকায়গত বাধা অপসারণের জন্য চল আমরা আত্মনিয়োগ করি। সে তাহাতে সম্মত হয়। সেই সময় উভয়ের মধ্যে আপোষ-মীমাংসার শর্ত আলোচিত হয়। বিশুদ্ধানন্দ কোন বিদেশীর সাহায্যে কিংবা মধ্যস্থতায় মিলন গৌরবজনক মনে করে না। আমরাও তাহাতে সম্মতি জানাই। কারণ, বিদেশী ভিক্ষু হইতে আমাদের ভিক্ষুরা ধর্ম-বিনয়ে কোন অংশে ন্যূন নহেন। উভয় দলের নিজ নিজ সীমা ত্যাগ করিয়া আরো সম্মুখের দিকে অগ্রসর হইলে মিলন হইতে পারে। বিশুদ্ধানন্দ সামগ্রী-উপোসথ করিয়া মিলনের প্রস্তাব করে। ইহাতে আমরা সম্মত হই নাই। স্বনিকায়ের ভিক্ষুগণের মধ্যে দৈবাৎ বিচ্ছেদ ঘটিলে সামগ্রী-উপোসথে পুনর্মিলন হইতে পারে, যেমন ১৯৩০ সালে রাঙ্গুনিয়ায় সংঘরাজ দলের মধ্যে এবং অন্য সময় রামদাস ও তিতন মাথের দলের মধ্যে পুনর্মিলন হইয়াছে। সংঘরাজ সারমেধ মহাথেরের প্রাধান্যে যাঁহারা উপসম্পদা গ্রহণ করিয়াছেন, আর যাঁহারা গ্রহণ করেন নাই, তাঁহাদের মধ্যে প্রথম হইতেই স্বাতন্ত্র্য ছিল। সুতরাং এই উভয় দলের সামগ্রী-উপোসথে মিলন হইতে পারে না। পক্ষান্তরে, পুনঃ নূতন উপসম্পদা গ্রহণ করিয়া কয়েকজন মিলিত হইলেও– এই শতাব্দীকাল পর্যন্ত নিকায়গত সমস্যার প্রকৃত সমাধান হয় নাই। সুতরাং উভয়দিক বিবেচনা করিয়া ধর্ম-বিনয় ও মিলিতদের পদমর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখিয়া

মিলনের উপায় সম্পর্কে আমরা আলোচনা করি। আলোচনার পর বিশুদ্ধানন্দ বলে যে, শ্রীবঙ্গীশ ভিক্ষুর সহিত পরামর্শ করিয়া এই সম্বন্ধে তাহার অভিমত জানাইবে।

বার্মার কর্তব্য শেষ করিয়া বিশুদ্ধানন্দ দেশে যাইবার জন্য আমার সহিত দেখা করে। আমি মিলনের বিষয় স্মরণ করিয়া দিই। সে বলে– তাহার বক্তব্য শ্রীবঙ্গীশ ভিক্ষুকে বলিয়াছে, সে-ই আমার সহিত এ বিষয়ে আলোচনা করিবে। আমরা বঙ্গীশের অপেক্ষায় রহিলাম। কিছুদিন পরে বঙ্গীশ ভিক্ষুও দেশে যাইবার জন্য বিদায় নিতে আসে। মিলন সম্বন্ধে কিছু না বলার কারণে তাহাকে জিজ্ঞাসা করি। সে বলিল যে, বিশুদ্ধানন্দ বলিয়াছে– বঙ্গীশ আলাপ করিবে। এই বিভ্রান্তি র জন্যই আমাদের মধ্যে আলাপ হয় নাই। তখন বিশুদ্ধানন্দের সহিত আলোচনার ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণিত হইল। সে বলে- দেশে গিয়া বিশুদ্ধানন্দের সহিত পরামর্শ করিয়া আমাকে পত্র দিবে। তাহার কোন পত্র আজ পর্যন্ত পাই নাই। আমিও রেঙ্গুন ছাড়িয়াছি।

১৯৫৭ সালের শেষের দিকে আমি দেশে যাই। চট্টগ্রাম সহরে প্লেন অফিসেই শ্রীমান শান্তপদ স্থবিরের সহিত দেখা হয়। পরলোকগত সংঘনায়ক ধর্মানন্দ মহাস্থবিরের প্রথম মৃত্যু-বার্ষিকী উৎসব মির্জাপুরে উদযাপন করিবে, আর সেই উপলক্ষে ধর্মাধারের জয়ন্তী- কমিটি গঠন করিবে, সেই সভায় ভিক্ষুদের দল-মিলনের আলোচনার জন্য দুইখানা নিমন্ত্রণপত্র মুদ্রিত হইয়াছে– উহা নিবার জন্যই সে আসিয়াছে। মহাস্থবিরের মৃত্যু-বার্ষিকী ব্যতীত আমরা অপর কাজে বাধা দিলাম। কারণ, তখনও আমরা গুরুদেবের জয়ন্তী করিতে পারি নাই। এমতাবস্থায় আমার জয়ন্তীর কথা উঠিতেই পারে না, আর প্রথমতঃ উভয় দলের ভিক্ষুদের সম্মত না করিয়া জনসভায় মিলন সম্ভব নহে। শান্তপদ বলিল, বঙ্গীশ ভিক্ষুর সহিত তাহার আলোচনা হইয়াছে, তাঁহারা মিলিতে রাজী আছেন। ভাল কথা, বঙ্গীশের সহিত সাক্ষাতের জন্য আমরা মিন্টো প্রেসে যাই। সে বলিল- পরদিন প্রাতে বিশুদ্ধানন্দও আসিবে। তাহার সাক্ষাতেই আলোচনা হইবে। আমরা সম্মত হইলাম। বিকালে বৌদ্ধ সেবাসদন হইয়া উনাইনপুরা যাত্রা করিলাম। পরদিন মিন্টো প্রেসে বিশুদ্ধানন্দ প্রভৃতির সহিত দল-মিলনের আলাপ হইল।

এই আলাপেও বিদেশীর মধ্যস্থতা কিংবা বিচার অবাঞ্ছিত ছিল। সামগ্রী-উপোসথ ও পুনঃ উপসম্পদার বিষয় পরিত্যক্ত হইল। বহু আলোচনার পর মধ্যপন্থা হিসাবে দলহী-কর্মবাক্যদ্বারা মিলনের কথা হইল। এই শেষ সিদ্ধান্তে

দক্ষিণদিকের মহাস্থবিরগণ সম্মত না হইলে কি করা হইবে? বিশুদ্ধানন্দ এই প্রশ্ন তুলিয়াছিল। আমাদের বক্তব্য ছিল–সংঘরাজ নিকায়ের ভিক্ষুদের সম্মত করিবার ভার আমাদের, আর মহাস্থবির দলকে সম্মত করিবার ভার তোমাদের উপর। এক পক্ষ অন্যপক্ষের জন্য চিন্তার কারণ নাই। যদি তোমরা ইহাতে রাজী থাক, তবে আজই চারজনের স্বাক্ষরে সন্ধিপত্র রচিত হউক। উভয় দলকে সম্মত করিয়া এক নির্দিষ্টদিনে ইহা কার্যকরী হইবে, আর সেই সঙ্গে জনসভায় এই ঐতিহাসিক মিলন ঘোষিত হইবে। যদি উভয় দলকে সম্মত করা না যায়, তবে মিলনের প্রস্তাব পরিত্যক্ত হইবে।

বিশুদ্ধানন্দ বলিলঃ "মিলন ভাল কথা, তবে পাঁচখাইনের ভন্তের (শ্রদ্ধেয় শশী মহাস্থবিরের) মত জানিয়া আপনাদিগকে বলিব।" আমি বলিলাম দেখ, দুই বৎসর হইতে আলোচনা চলিতেছে। আজ প্রারম্ভে বলিলে- তুমি কিংবা বঙ্গীশ বলিলেই চূড়ান্ত হয়। এখন আলোচনা-শেষে পাঁচখাইন ভন্তের দোহাই! সুতরাং তোমাদের মনোভাবের পরিচয় মিলিল। অতঃপর কেহ দল-মিলানের কথা বলিবে না। ভিন্নভাবে আমরা সদ্ধর্মের কাজ করিয়া যাইব। কাহারো ধারণা- দল মিলিলে তাহাদের প্রাধান্য থাকিবে নাথ– পূর্বপুরুষের জমিদারী নষ্ট হইবে! এই অবস্থায় বিচার ব্যতীত নিদান দেওয়ার ও বাদীপক্ষ স্বয়ং বিচারক সাজার কথা কোন স্থিরমস্তিষ্ক বলিতে পারে কি? উভয় দলের আপোষ-মীমাংসার চেষ্টাকে বানচাল করার উদ্দেশ্য কি? সারাজীবন নিকায়-বিশেষের পক্ষে ওকালতিই এর জন্য দায়ী নহে কি? দেখা গিয়াছে, পিত্তনের মাথা খারাপ হইলে অভ্যাসবশতঃ ছেঁড়া কাগজ ঘরে ঘরে বিলি করে, আর বিচারকের হইলে যত্র-তত্র রায় লেখেন। উকিলেরা শুধু বাদী-বিবাদী দেখেন।

এই দল্হী-কর্ম সম্বন্ধে বিনয়ের সূক্ষ্মবিচার শুধু গৃহীরাই কেন, ভিক্ষুদের মধ্যেই বা কয়জন হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন? মুচ্ছদ্দীবাবু যেমন ইহার অপব্যাখ্যা করিয়াছেন, তেমন কোন কোন ভিক্ষু হইতেও ইহার প্রতিবাদ পাইয়াছি। যদি মিলন ঘটে, তবে এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা প্রদর্শন অসম্ভব নহে। সম্ভবতঃ দল-মিলনে এরূপ উদার প্রস্তাব- এই শতাব্দীকালের মধ্যে ইহাই প্রথম। কেবল সামগ্রিক মিলনের জন্যই ইহা প্রযুক্ত হইতে পারে। পক্ষান্তরে, ব্যক্তিগত মিলনের জন্য সেই সনাতন-নীতি অক্ষুণ্ন থাকিবে।

সদ্ধর্ম ও মিলিতদের মর্যাদা অক্ষুণ্ন রাখিয়া মিলনই আমাদের লক্ষ্য। যদি অন্য উপায়ে এই মিলন ঘটে তাহাও সাদরে অভিনন্দনীয়। আমার পন্থাই সত্য, অপর সব মিথ্যা, এই দাবী করি না।

আমাদের বিশ্বাস মুচ্ছদ্দীবাবুর জন্যই এই প্রত্যাশিত মিলন পিছাইয়া যাইতেছে। তাঁহার তথাকথিত সম্মুখ-বিনয় অর্থাৎ বাদী-বিবাদী উভয়পক্ষের জবানবন্দী লিপিবদ্ধ ও ইংরেজীতে অনুবাদকপূর্বক কোন বিদেশী ভিক্ষুর রায় না পাওয়া পর্যন্ত তিনি এই মিলন ঘটিতে দিবেন না।

মুচ্ছদ্দীবাবু সংঘরাজ নিকায়ের সম্পাদকের নিকট ২।২।৬৩ ইং পত্র লিখিয়াছেন ঃ "গতকল্য শ্রীমৎ প্রিয়ানন্দ ভিক্ষু আসিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের ভিক্ষু সমিতির আবেদনের উত্তর আনিয়াছেন। দুইটি প্রস্তাবের যে কোনটাই তাঁহারা সম্মত আছেন। বিনয়-বিধানমতে উভয়পক্ষ সামগ্রিক-উপোসথ বা একসঙ্গে কর্মবাক্য পাঠ করিয়া মিলন ঘটাইতে পারেন।..."

দেখা যায়, মহাস্থবির নিকায়ের ভিক্ষুসভায়ও মিলনের প্রস্তাব হইয়াছে। সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার এক অধিবেশনেও শ্রদ্ধেয় শ্রীরমেশচন্দ্র মহাস্থবিরের ন্যায় দ্বিতীয় কর্মবাক্যে মিলনের প্রস্তাব হইয়াছে। যদি মিলনের শুভেচ্ছা না থাকে, তবে তাঁহারা এই প্রস্তাব গ্রহণ করিবেন কেন? মিলন উভয় দলের কাম্য, তথাপি উপায়ের সামঞ্জস্যবিধানের প্রয়োজন আছে। এমতাবস্থায় মুচ্ছদ্দীবাবু নিঃসঙ্কোচে বার বার মন্তব্য করিতে পারিলেন ঃ "প্রকৃতপক্ষে কোন পক্ষেরই মিলনের আগ্রহ নাই, আগ্রহ আছে মাত্র আমাদের বা আমার।" [- শেষ বক্তব্য, ১ম পৃঃ] এতবড় আত্মম্ভরিতা! তাঁহার পক্ষে শোভনীয় কি? ভিক্ষুমাত্রেই বিচ্ছেদপ্রিয়, শুধু তিনিই কি মিলন প্রিয়? উভয় ভিক্ষুসভার প্রস্তাবগুলি কি অনাগ্রহের নিদর্শন? তাঁহাদের তথাকিথত 'সম্মুখ-বিনয়' ও 'তৃণাচ্ছাদন-কর্ম' মিলনেচ্ছুদের কেহ গ্রাহ্য করিলেন না বলেই ভিক্ষুদের মিলন-প্রস্তাব বানচাল করিবার উদ্দেশ্যেই মুচ্ছদ্দীবাবুর এই উক্তি নহে কি? স্মরণ রাখা উচিৎ যে, উপসম্পন্নের সহিতই উপসম্পন্নের এইসব বিনয়কর্ম চলিতে পারে। এইক্ষেত্রে দল্হী কর্মবাক্য পাঠ ব্যতীত মিলনের অন্য পন্থা নাই।

পশ্চাদপসরণ

মুচ্ছদ্দীবাবু লিখিয়াছেন ঃ "ভান্তে মূল বিষয়ে মহিমান্বিত মহাস্থবিরগণের উক্তি ও প্রস্তাবাদি গোপন করিয়া শুধু আমার উক্তিই বড় বড় অক্ষরে বার বার উল্লেখ করিয়াছেন আমি যেন এই সমুদয় জ্ঞানীগণের চেয়েও মস্তবড় এক authority... বিংশতি বৎসর বয়সের পূর্বে ভিক্ষুরা উপসম্পদা গ্রহণ করিতেন ইহা আমি কোথাও বলি নাই...।" [- শেষ বক্তব্য, ১৩ পৃঃ] দীর্ঘ ৩৬ বৎসর পরে

বহু জল ঘোলা করিয়া শেষ পর্যন্ত মুচ্ছদ্দীবাবু শ্রদ্ধেয় রামধন মাথের উপসম্পদা সম্বন্ধে ভুল স্বীকার করিয়াছেন। অথচ ১৫।৮।৫২ ইং তারিখের 'আমার নিবেদন'-এ তাহা স্বীকার করেন নাই।

মহাস্থবির-নিকায় সম্বন্ধে মুচ্ছদ্দীবাবুর উক্তি ছাড়া কাহারো কোন প্রস্তাব আমরা পাই নাই। শ্রদ্ধেয় দাস্যা মাথে, তিতন মাথে, রাধু মাথে, অভয় মাথে কিংবা তৎপূর্ববর্তী কোন মাথে থেরবাদ উপসম্পদা গ্রহণের বা নিকায়-সৃষ্টির ঐতিহাসিক কোন তথ্য রাখিয়া যান নাই, কিংবা আমাদের জানা নাই। শুধু মুচ্ছদ্দীবাবুকে বারবার বলিতে শুনিয়াছি– শ্রদ্ধেয় অগ্রসার মহাস্থবিরের নিকট 'এবং মে সুতং'। এখন ঐ নিকায়ের authority কাহাকে বলা যায়?

মুচ্ছদ্দীবাবু সংঘরাজ সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে এত অসামঞ্জস্যপূর্ণ উক্তি করিয়াছেন যে, উহার একটি সত্য হইলে অন্যগুলি অসত্য হয়ঃ

- ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে 'মাতৃপূজায় মানবধর্ম'-এ লিখিয়াছেন ঃ "১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে আরাকানের প্রথিতযশাঃ স্বর্গীয় সংঘরাজ মহোদয় চট্টগ্রামের ভিক্ষুগণকে বিনয়মতে উপসম্পদা দীক্ষা প্রদান করেন।" - ১২৩ পৃঃ
- ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে 'রামধন স্মৃতি ভাণ্ডার'-এ "...আরাকানের স্বনামধন্য সংঘরাজ প্রভাত-সূর্যের ন্যায় উদিত হইলেন।..." ১ম পৃঃ
- ১৯৫০ খৃষ্টাব্দে 'বিশ্ব-বৌদ্ধ সম্মেলন ও আমাদের সমাজ'-এ "ঁ রাধাচরণ মহাস্থবির ব্রহ্মদেশ হইতে সংঘরাজকে আনয়ন করেন এবং যথার্থ স্থবিরবাদমতে তিনি সংস্কার করেন।"
- ১৯৫২ খৃষ্টাব্দে 'আমার মন্তব্য'-এ- "...তাঁহারা মান্দালয় হইতে ঁগুণামেজু মহাস্থবিরের যোগে তাঁহার গুরু ব্রহ্মদেশের সংঘরাজ ও অন্যান্য কয়েকজন পণ্ডিত ভিক্ষু মহাসমালোহে স্থলকূল রত্নাকর চিং প্রতিষ্ঠিত করেন।" - ৭ পৃঃ
- ১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে গৌতম-মণ্ডপে 'বুদ্ধ-জয়ন্তীর ভাষণ'-এ– "আরাকানের সংঘরাজ পূজনীয় সারমিত্র এসে বৌদ্ধ-সমাজের সংস্কারসাধন করেন।" – ৭ পৃঃ
- ১৯৬২ খৃষ্টাব্দে 'শাসনবংশ' পাঠের পর 'আমার নিবেদন'–এ লিখিয়াছেন ঃ "গুণামেজু মহাস্থবির তাঁহার গুরু মান্দালয়-এর সংঘরাজ ও অন্যান্য ভিক্ষু আনাইয়া সকলে একত্রযোগে সীমাস্থাপন করিয়াছেন।"

এইসব কারণেই আমরা লিখিয়াছি ঃ "রাজানগরের সীমাপ্রতিষ্ঠায় সংঘরাজের উপস্থিতি এবং তিনি যে ঁ গুণামেজুর গুরু এ বিষয় আপনি স্বীকার করেন। তবে সত্য গোপনের জন্য তাঁহাকে মান্দালয় হইতে আমদানী করিতে চান।" [-পত্র ও নিবেদনের জবাব, ১১ পৃঃ] আমার এই উক্তি কি দিন-দুপুরে ডাকাতি? মুচ্ছদ্দীবাবু ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে আরাকান হইতে যাত্রা করিয়া ব্রহ্মদেশের মধ্য দিয়া ১৯৬২ সালে সংঘরাজকে লইয়া মান্দালয় পৌছিলেন। (উপরোক্ত ৬টি উদ্ধৃতির মধ্যে ৩ বার আরাকানের, একবার ব্রহ্মদেশের ও ২ বার, মান্দালয়-এর সংঘরাজ উক্ত হইয়াছে।) এই পরিক্রমা কি রাত্রিতে হইয়াছিল? চমৎকার ওকালতি বটে!

পূর্বোক্ত উক্তি সমূহের মধ্যে অসত্যগুলিই প্রমাণিত করিব। সংঘরাজ সারমেধ-এর জীবনী পাঠে জানা যায়, মান্দালয়-এর সংঘরাজ উঃ জ্ঞেয় ধর্মাভিবংশ....মহাথের ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। তৎপর আর কাহাকেও 'শাসন-বাইং' বা সংঘরাজপদে বরণ করা হয় নাই। সুতরাং রাজানগর সীমাস্থাপনের সময় ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে (১২৩১ মগাব্দ) মান্দালয়-এ ব্রহ্মদেশের সংঘরাজের অস্তিত্বই ছিল না। এমতাবস্থায় ব্রহ্মের সংঘরাজকে মান্দালয় হইতে কি প্রকারে আমদানী করা চলে? তথাপি তিনি প্রশ্ন উত্থাপন করিয়াছেন ঃ "১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে রাণীর নিমন্ত্রণে মান্দালয়-এর সংঘরাজ ও তথাকার অন্যান্য ভিক্ষুর আসা কি অসম্ভব"? [-শেষ বক্তব্য, ১৯ পৃঃ] হাঁ, সম্ভব, যদি স্বর্গ হইতে মান্দালয়-এর সংঘরাজের প্রেতাত্মা আসেন। অথবা, উকিলদের নিকট যদি কোন 'মৃত-সঞ্জীবনী' থাকে! তিনি ঐ স্থানে আবার লিখিয়াছেন ঃ "সংঘরাজ সারমিত্র দ্বারা যে রাজানগর সীমা স্থাপিত হয় নাই অকাট্যপ্রমাণে তাহা খণ্ডিত হইল।" ইহার অর্থ কি? চিন্তা করিলে হাসি পায়! এইসব কাহিনী তাঁহারই ভাষায় 'বানাওট'।

বলা বাহুল্য যে, সংঘরাজ সারমেধ রাজা মিগুন্ মিন্-এর আহ্বানে ১৮৬৮ সালের বর্ষাকালে মান্দালয়-এর সংগায়ণে সহযোগিতা করেন। বর্ষার পর ৩য় বার রাজকীয় উপাধিলাভ করিয়া ২৫ জন ব্রহ্মদেশীয় ভিক্ষুসহ আকিয়াব ফিরিয়া আসেন। সুতরাং শ্রদ্ধেয় সারমেধ মহাথেরের পক্ষেই ১৮৬৯ সালে রাজানগরে সীমাস্থাপনে মান্দালয় হইতে আসিয়া যোগদান করা সম্ভব। তাঁহার উপস্থিতি "আবোল তাবোল" [-৭ পৃষ্ঠা] ও "মূলতত্ত্ব"-এ-ও [-৫ পৃষ্ঠা] স্বীকৃত হইয়াছে। তখন বিংশতি বৎসর বয়সের পূর্বে ভিক্ষুদের উপসম্পদার কথা তিনি কোথাও না বলিতে পারেন। সত্য বলিলে ওকালতি চলিবে না। কিন্তু আচার্য চন্দ্রমোহন

ও অন্যান্য মহাস্থবিরদের সত্যভাষণ তিনি কি অস্বীকার করিতে পারেন? ৭ বৎসর ভিক্ষুভাবে যাপন করিয়াও আচার্য চন্দ্রমোহন নিজের ভুল বুঝিতে পারেন নাই। পল সাহেবই সেই ভুল প্রদর্শন করিলেন। তখন থেরবাদ-বিনয় ও তান্ত্রিকধর্ম সম্বন্ধে আমাদের 'রাউলীরা' কিছুই জানিতেন না, কেবল অনুকরণ করিতেন মাত্র।

শ্রদ্ধেয় রামধন মাথের উপসম্পদা যে ১৮ বৎসরে হইয়াছিল- তাহা clerical mistake নয়, আসলে উহা গাণিতিক-সত্য। নানা কথা বলিয়া পশ্চাদপসরণের শত চেষ্টা করিলেও মুচ্ছদ্দীবাবুর অব্যাহতি নাই। কারণ জ্যা-মুক্ত শর আর ফিরিয়া আসিবে না।

দ্বিতীয় প্রশ্নে- তিনি কল্পনা করিয়াছেন, সংঘরাজ উপসম্পদাদানের জন্য একাকী আসেন এবং স্থানীয় অন্ততঃ ৪ জন ভিক্ষু লইয়া শ্রদ্ধেয় লালমোহন ভিক্ষু প্রভৃতিকে উপসম্পদা দিয়াছেন। থেরবাদ মতে যাঁহাদের উপসম্পদা নাই বলিয়া পুনরায় উপসম্পদা দিতেছেন, তাঁহাদিগকেই গণপূরক করিবেন, ইহা নিছক কল্পনা-বিলাস! সংঘরাজের জীবনীতে আছে– তিনি উপসম্পদার প্রয়োজনীয় ভিক্ষু সঙ্গে আনিয়াছিলেন। ইহাই তান্ত্রিক-রাউলীদের প্রথম থেরবাদ-উপসম্পদা। তৎপূর্বে রাউলীদের থেরবাদ-উপসম্পদা গ্রহণের ঐতিহাসিক কোন প্রামণ নাই।

৩য় প্রশ্ন 'ঠাকুর-গড়ানি'

১৮৪১ অব্দে মহামুনি পাহাড়ের এক মাইল পূর্বে 'হাঞ্চাও'-র ঘোণায় সীমা-প্রতিষ্ঠার এক ভ্রান্তপ্রবাদ প্রচলিত আছে। ১৮৬৪ অব্দে সংঘরাজ সারমেধ মহাথের কর্তৃক শ্রদ্ধেয় জ্ঞানালঙ্কার প্রমুখ ভিক্ষুগণকে তথায় উপসম্পদা প্রদত্ত হয়। পরবর্তীকালে ঐ স্থানের নাম হয় 'ঠাকুর-গড়ানি'। ইহা বদ্ধ-সীমা অর্থাৎ ভিক্ষুদের দ্বারা কর্মবাক্য পাঠে নির্মিত সীমা নহে। ইহা প্রকৃতিজাত-সীমা। সংঘরাজের জীবনীতে দেখা যায়, জ্ঞানালঙ্কার প্রভৃতিকে সেই নদী-সীমায় বা উদক-উক্ষেপ সীমায় উপসম্পদা প্রদত্ত হইয়াছে।

শতাব্দীকাল পূর্বে উহা পার্বত্যছড়া ছিল। তাহাতেই উপসম্পদা আদি বিনয়কর্ম চলিত। বর্তমানে ঐ স্থান ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। জমির দক্ষিণ পার্শ্বে ক্ষুদ্র ছড়া এখনও প্রবাহিত। জমি ও ছড়ার মধ্যে সামান্য উচ্চ জায়গা আছে– উহাই উক্ত 'ঠাকুর-গড়ানি'। তাহাতে পাথরের কোন নিমিত্ত বা সীমার চিহ্ন

নাই। স্থানটা সীমার উপযোগী ও পঁচিশজন ভিক্ষু বসিয়া বিনয়-কর্ম করিবার মত প্রশস্তও নহে। আমরা উহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। জমি আবাদকারীদের কেহ তথায় সীমার চিহ্ন দেখেন নাই। সংঘরাজের বর্ণনা হইতে ভ্রান্তধারণার নিরসন হইল। উহা বদ্ধসীমা নহে। মহামুনি মন্দির উৎসর্গের সময় যদি প্রকৃতই সীমা বাঁধিতে হয়, তবে এক মাইল দূরে ঝাড়-জঙ্গলের মধ্যে হাঞ্চাও-র ঘোণায় যাওয়ার প্রয়োজন কি? মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে বিস্তীর্ণ জায়গা রহিয়াছে– তাহাতে কি সীমা নির্মিত হইত না? ইহাতেই প্রমাণিত হয় যে, রাজানগরই ১২৩১ মগাব্দে সর্বপ্রথম থেরবাদী বদ্ধ-সীমা প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞানন্দ ভন্তের উক্তি সত্য, তৎপূর্বে চট্টগ্রামে প্রকৃত কোন ভিক্ষু-সীমা ছিল না। রাউলীদের সীমা সম্বন্ধে কোন ধারণাই ছিল না। ইহার পর আচার্য চন্দ্রমোহনের উদ্যোগে পাহাড়তলী শাক্যমুনি মন্দির-পার্শ্বে সীমা নির্মিত হয়। উহা বাংলার বৌদ্ধদের ঐতিহাসিক দ্বিতীয় সীমা।

এই আলোচনায় প্রমাণিত হইল যে, 'ঠাকুর-গড়ানি' বদ্ধ-সীমা নহে। ১৮৪১ খৃষ্টাব্দে মান-রাজার সীমা-প্রতিষ্ঠার কথা কল্পনা-বিলাস মাত্র। তখন উহা নদী-সীমা ছিল। ধান্যক্ষেত্রে পরিণত হওয়ার পর তাহা আর নদী-সীমাও নাই। তথাপি দেখা যায়, ১৯৩৬ সালে মাথের দল-এর ভিক্ষুরা তথায় পাহাড়তলীর শ্রীশীলবংশ (পাখী)কে সমারোহে উপসম্পদা দিয়াছেন। সীমা-সম্পত্তি ব্যতীত তাহার উপসম্পদা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কি? অথচ এখনও সে সশরীরে ভিক্ষু। 'মূলতত্ত্ব'-এ উক্ত পারাজিকা-অপরাধী, থেয়্য-সংবাসক, অপূর্ণ বয়স্ক উপসম্পন্ন ও শীলবংশের ন্যায় অ-সীমায় উপসম্পন্ন ইহারা কি থেরবাদী ভিক্ষু? তাহাদের সহযোগে কৃত উপসম্পদা, সীমাবন্ধনাদি বিনয়সম্মত হইবে কি? এইসব কারণেই 'মূলতত্ত্ব'-এ ধর্ম-বিনয় শিক্ষাগ্রহণের পরামর্শ দেওয়া হইয়াছে, তাহা হইলে নিজেদের এই সকল গলদ ধরা পড়িত। গৃহীদের জন্য বিনয়-বিধান নাই, এই অজুহাতে মুচ্ছদ্দীবাবুরা স্বাধীন, যথেচ্ছ বলিতে ও করিতে পারেন। কিন্তু যাহারা ভিক্ষুত্বের জন্য সর্বস্বত্যাগী ও নিবেদিতপ্রাণ এইসব ভুল-ত্রুটির প্রতিকারকল্পে তাঁহাদের করণীয় কি কিছুই নাই? শুধু দলেই কি আমাদের স্বর্গ-মোক্ষ আহরণ করিবে?

চতুর্থ প্রশ্ন

এই প্রশ্নের প্রথম অংশের আলোচনা পূর্ববর্তী প্রশ্নে হইয়াছে। আচার্য পূর্ণাচার মহাথের ১২২৮ মগাব্দে সিংহল হইতে চট্টগ্রাম আসেন। "তদনন্তর চৈত্র মাসে চাক্‌মা সার্কেলে গিয়া তত্রত্য ভূতপূর্ব রাজা ধরমবক্স রায়ের পতিব্রতা পত্নী শ্রীমতী কালিন্দী রাণীকে ধর্মোপদেশ দিতে আরম্ভ করেন। .... তৎপর ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া দেখিলেন, চট্টগ্রাম হইতে বুদ্ধশাসন এক প্রকার তিরোহিত হইয়াছে। বিনয় ধর্মের আলোচনা নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ....তিনি স্থির করিলেন যে, প্রথমে একটি সীমা নির্মাণ করিতে হইবে। .... কাজে-কাজেই একজন ধনাঢ্য দায়িকার আশ্রয় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। সেই দায়িকা পরম পুণ্যশীলা শ্রীমতী কালিন্দী রাণী। .....তৎপর প্রতিরূপ দেশ হইতে.... ভিক্ষু আনাইয়া রাঙ্গুনীয়া গ্রামের রাজবিহারে .....একটা সীমা প্রস্তুত করিলেন। সেই হইতে চট্টলে বুদ্ধ শাসন-এর পরিশুদ্ধ বীজ বপিত হইল।" [পুণ্যাচারী ধর্মধারীর জীবন-চরিত, ৩০ পৃঃ] ইহাতে প্রমাণিত হইবে যে, ঐ সীমা সম্বন্ধে মুচ্ছদ্দীবাবু যাহা শুনিয়াছেন- তাহা কল্পিত, যিনি শুনাইয়াছেন, তিনি পক্ষপাত-দুষ্ট।

পঞ্চম আলোচনা

ইহা কল্পনাপ্রসূত। সংঘরাজের নিকট উপসম্পদা গ্রহণের পূর্বে বাঙালি বৌদ্ধদের মধ্যে থেরবাদ উপসম্পদা ছিল না। যে কোন বয়সের লোককে উপসম্পদা দিয়া আবার দশশীল দিতেন। ঐ দশশীলধারীরাই ক্রমশঃ পাঞ্জাং, কামে, মাথে হইতেন। -সদ্ধর্ম রত্নাকর, ৪৪২ পৃঃ

সংঘরাজের দোভাষীরূপে রাধুমাথের কল্পনা ভিত্তিহীন। ইহার দুই শতক পূর্ব হইতেও আরাকানে বাঙালা ভাষা প্রচলিত ছিল। পণ্ডিত আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ সম্পাদিত 'আরাকান রাজসভায় বাঙলা ভাষা' উহার প্রমাণ দিবে। সংঘরাজের শিক্ষা-দীক্ষা ও জীবনের প্রথম ৩০ বৎসর কাল চট্টগ্রামের হাড়ভাঙ্গ-এ চলিয়াছে। তাঁহাকে চট্টল-সন্তান বলিতে বাধা কোথায়? তখনকার বাঙালা তিনি জানিতেন। ১৯২৪-২৫ সালে আরাকানের সুইজাদি সেয়াদকে বাঙালা ভাষায় ধর্মালোচনা করিতে দেখা গিয়াছে। আভার রাজা বোধ-ফ্রা-র আক্রমণ না হইলে আরাকান হয়তঃ এতদিন বাংলা ভাষী অঞ্চলে পরিণত হইত।

ইহার বিষয়বস্তু তাঁহার ব্যক্তিগত অনুস্মৃতি। প্রথমে উহা তাঁহার ছেলের নামে এবং পরে "কৃষ্টি-প্রচার সংঘ"-এর নামে পূর্বে প্রচালিত হইয়াছে। তাহা হয়ত পর্যাপ্ত নহে। 'পাকিস্তানী ভিক্ষুগণের মিলনে' ইহার মূল্য কতটুকু তাহা সহৃদয় পাঠকবর্গের বিচার্য। এই ৪০ পৃষ্ঠার বিস্তৃত উত্তর নিষ্প্রয়োজন।

আমাদের কয়েকটি সামাজিক মীমাংসার উদাহরণ দেওয়ায় মুচ্ছদ্দীবাবু অসহিষ্ণু হইয়া বলিয়াছেন ঃ "ভিক্ষুদের সর্বনাশা ঐক্যনাশ ও অনৈক্যের মূলে তিনিই।" [- শেষ বক্তব্য, ২০ পৃঃ] 'রামধনস্মৃতি-ভাণ্ডার'-এর ন্যায় আমা দ্বারা ভিক্ষুদের তিনের স্থলে কি চারি দল হইয়াছে? কিংবা ঐ দলগুলি কি আমিই সৃষ্টি করিয়াছি? "মুখমস্তী'তি বক্তব্যং দশহস্তা হরিতকী"-মুখ থাকিলেই কি বলিতে হইবে যে, হরিতকী দশ হাত লম্বা! মুদিতার দৈন্যই ইহার কারণ। বস্তুতঃপক্ষে, সমাজে আমরা যত বিবাদ মীমাংসা করিয়াছি তাহার তুলনা নাই।

১৯৩৮ সালের প্রথমে ভগীরথ নগরে বৌদ্ধ মহাসভার ব্যাপারে গঠিত অভ্যর্থনা সমিতির বিবরণ দিয়া তিনি তথায় আমাদের যোগদানের কথা বলিলেন। তখন আমরা ব্রতী বা অতিথি কি হিসাবে সহযোগিতা ইচ্ছা করেন, জিজ্ঞাসা করি। তিনি উভয় সহযোগিতার ব্যাখ্যা চাইলেন। ব্যাখ্যা শুনিয়া তিনি উভয়বিধ সহযোগিতা চাইলেন। আমরা বলি- তাহা হইলে গঠিত অভ্যর্থনা সমিতি ভাঙ্গিয়া দিন- সংঘরাজ নিকায়ের প্রতিনিধির উপস্থিতিতে পুনঃ অভ্যর্থনা কমিটি গঠন করুন। কিংবা, উহা সমর্থন করাইয়া লউন। তাঁহার আপত্তি ছিল সংঘরাজ নিকায় বৃহৎ, এত লোক ডাকা কি সম্ভব? আমাদের বক্তব্য ছিল, বৃহৎকে আমরা ছোট করিয়াছি। 'চট্টল ভিক্ষু-সংঘ'-এর মাধ্যমে ১২ জন প্রতিনিধি হইলে সমগ্র সমাজের কাজ চলে। সেই অনুপাতে সামর্থ্যানুসারে প্রতিনিধি মিলিত হইয়া অভ্যর্থনা কমিটি গঠিত হউক। ইহাতে সংঘরাজ নিকায় উপেক্ষিত হইয়াছে। তাঁহার সঙ্গে যে দুইজন উকিল ছিলেন তাঁহারা ঐ দলের নহে বলিয়া তাঁহারাও তথায় আহুত হন নাই। রেবতীবাবু, বীরেন্দ্র মুচ্ছদ্দীর ন্যায় সমাজের বিশিষ্ট শ্রেণীর লোক ও তথায় উপস্থিতির সুযোগ পান নাই। অথচ স্বদলের বহু লোক আহুত হইয়াছেন। ৫০০ স্বেচ্ছাসেবকের মধ্যে সংঘরাজ নিকায়ের দায়ক একজনও ছিলেন না। জাতীয় মহাসভা কেবল একদলের ব্যাপার নহে।

বুঝিয়া বলিবার সময় নিয়া তিনি বিকালে অসামর্থ্য প্রকাশ করিয়াছিলেন।

আমাদিগকে শুধু অতিথি হিসাবে আহব্বান করিলে ডেপুটেশনের প্রয়োজন কি ছিল? নিমন্ত্রণ পত্র দিলেই ত চলিত। দলীয় মনোভাবের দরুণ ঐ সভা শুধু সঙ্কীর্ণ হয় নাই, অধিকন্তু পূর্বাপর ঐতিহ্যের সহিতও বিচ্ছিন্ন ছিল। যদি চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি কিংবা সমাগমের মাধ্যমে ঐ মহাসভা আহূত হইত তবে ৬০ কিংবা ৭০ বৎসরের ঐতিহ্যের সহিত সম্পর্কিত হইত। তিনি তাহা করিবেন কেন? যেহেতু তখন তিনি সমিতি হইতে যেমন বাহিরে– সেইরূপ সমাগমেও সভাপতি কিংবা সম্পাদক নহেন। অনেকের মনোভাবঃ 'মমেব কতমঞ্ ঞস্তু গিহী পব্বজ্জিতা উভো" অর্থাৎ গৃহী, সন্ন্যাসী সকলে আমাকেই কর্মকর্তা মনে করুক! ইহাতে সুখের সময় 'চট্টল ভিক্ষু সংঘ' উপেক্ষিত হয়।

মুচ্ছদীবাবু 'আবেদন'-এ লিখিয়াছেন ঃ "...এই সব অনৈক্য ও দলাদলির মূল উৎস ভিক্ষুদের দল বিভাগ নহে কি?" আমরা ইহার প্রতিবাদ করিয়াছি। আমাদের স্মরণকালে সমিতি ও সমাগমের বিভেদ দেখিয়াছি। উহা আধুনগর কনফারেন্স-এর পরেই হয়। তিনি স্বীকার করিয়াছেন– 'তাহাতে কোন দলগত প্রশ্ন উঠে নাই।' [- শেষ বক্তব্য, ২৪ পৃঃ] বেশ! ইহাতে তাঁহার সহিত আমরা একমত। কারণ বিভক্ত উভয় অংশে সকল দলের লোক ছিলেন। সমিতি ও সমাগম মিলিত হইলেও পরবর্তী ১২ বৎসরের মধ্যে ঐ বিচ্ছেদ প্রবণতা সমাজকে ৬।৭ সমিতিতে পরিণত করিয়াছে এবং সভাপতিগণ কমিশনার পাহাড়ে সম্মিলিত হইয়া পরস্পরে পাদুকা উপহার দিয়াছেন, ভিক্ষুদের দল বিভাগ নিশ্চয়ই ইহার উৎস নহে। এমন কতকগুলি গ্রাম বা থানা আছে- সেখানে মাত্র এক সম্প্রদায়। তথাকার লোকেরা যে একতার শান্তি-সাগরে নিমজ্জিত-তাহা মনে করিবার উপায় নাই। কারণ, মানবীয় চরিত্রই চির পরিবর্তনশীল, কোন অবস্থায় স্থাণুবৎ থাকে না।

তিনি 'রামধন স্মৃতি ভাণ্ডার'-এ চারি দলের সৃষ্টি স্বপ্নের কথা বলিয়াছেন। তৎপর "প্রত্যেক দলের ৫ জন করিয়া মোট ১৫ জন মনোনীত ভিক্ষু উক্ত বৃত্তি মঞ্জুর করিবেন"- লিখিয়াছেন। [-ঐ, ২৭ পৃঃ] স্মৃতি ভাণ্ডার অনেকে বিস্মৃত হইয়াছেন। এই সুযোগে যথেচ্ছ বলা অসঙ্গত। স্মৃতি ভাণ্ডারের কার্য-বিবরণীর ৯ম পৃষ্ঠায় আছে ঃ "কর্ণফুলির উত্তর-কূলের সংঘরাজ সম্প্রদায় ভিক্ষুগণ হইতে ৩ জন ভিক্ষু, ঐ সম্প্রদায়ের দক্ষিণ-কূলের ভিক্ষুগণ হইতে ৩ জন ভিক্ষু এবং তিতন মহাস্থবির, অভয়াচরণ মহাস্থবির ও দাশ মহাস্থবির সম্প্রদায়ের ভিক্ষুগণ হইতে তিন তিন ভিক্ষু, মোট ১৫ জন ভিক্ষুকে লইয়া বৃত্তি বিতরণ- সভা গঠন হয়।" ইহারা কি প্রত্যেক দলের ৫।৫ জনের ১৫ জন? এক্ষেত্রে চারি দল সৃষ্টি

কি বাস্তব নহে? এই বিভেদের উৎস কে? তাঁহার ১৯২৮ ইংরেজীর উক্তির সহিত ১৯৬২ ইংরেজীর উক্তির সামঞ্জস্য আছে কি?

১৯৩৮ ইংরেজীর শেষে পূর্ব সাতবাড়িয়ায় চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির আহূত মহাসভার প্রাক্কালে শ্রীমৎ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ভিক্ষু প্রমুখ প্রতিনিধিদের সহ মুচ্ছদ্দীবাবুর বাড়িতে দুইদিন ব্যাপী আলোচনায় সমিতি ও সমাগম-এর মিলনের বিষয় তিনি স্মরণ করিতে পারেন না। তিনি বলেনঃ "কিন্তু কই তাঁহারা আমার নিকট আসিলে নিশ্চয় স্মরণ থাকিত।...ঐ মহাসভায় আমি উপস্থিত ছিলাম না।" [- শেষ বক্তব্য, ৩৮ পৃঃ] ইহা পাঠ করিয়া আমার এক গল্প মনে পড়িল। ১৯৫৭ সালে আমাদের সমাজের কোন স্বনামধন্য উকিল তাঁহার স্বীয় স্মৃতি-বিভ্রমের এক কাহিনী বিবৃত করিলেনঃ "তিনি এক মক্কেলের আর্জি লিখিয়া স্বাক্ষর করিবার সময় নিজের নাম ভুলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ইতস্ততঃ ভাব দেখিয়া মক্কেলেরা চাকর ডাকিয়া দিবে, কি তামাক সাজাইয়া দিবে- জিজ্ঞাসা করেন। তাহাতে তিনি বিরক্ত হন। অবশেষে হঠাৎ স্বীয় নাম স্মরণ হওয়ায় নাম স্বাক্ষর করিলেন।" যদি এরূপ কারণে মুচ্ছদ্দীবাবু বিস্মৃত হন- তবে তাহাতে আমার আত্মপক্ষ সমর্থনে বলার কিছুই নাই। আর, যদি তিনি ধর্মাধারের কৃতিত্ব অস্বীকারের জন্য বিস্মৃত হন- তবে প্রকৃত উকিলের কাজই করিয়াছেন। উহার প্রত্যক্ষ সাক্ষী শ্রীমৎদীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান মহাস্থবির বি. এ. এখনও সুস্থ শরীরে বিদ্যমান। চৌদ্দ বৎসরের বিভেদ কি বিনা চেষ্টায় মীমাংসিত হইল? "যেই সমাগমে পটিয়া থানার একটি গ্রাম ব্যতীত সমগ্র সমাজের সংহতি ছিল, সমাজের ৩/৪ জন শিক্ষিত ব্যক্তি ছাড়া সকল উকিল, মোক্তার, ব্যবসায়ীর সংযোগ ছিল, যাহার প্রয়োজন ছিল অসীম" - অনায়াসেই কি সেই সমাগমের সমাধি রচিত হইল?

সেই মহাসভায় অনুপস্থিতির কারণ তিনি কিছু বলেন নাই। তাহাও বিস্মৃত কিনা কে জানে। বিষয় নির্বাচনী সভায় চৌধুরী বাবুর নিকট শুনিয়াছিলাম- স্বগ্রামবাসী অনুগামীদের পরামর্শে তিনি মিলনে রাজী হওয়ায় ভিন্ন গ্রামবাসী অনুগামীরা মহাসভা বর্জনের সিদ্ধান্ত করেন। তখন তিনি 'শ্যাম রাখি কি কুল রাখি' অবস্থায় মিলনে সম্মত হইয়াও মহাসভায় যোগদানের সৎ সাহস করেন নাই। ঐ সভায় দলভিত্তিক কার্যকরী কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। প্রস্তাব কার্যকরী না হওয়া পর্যন্ত পরিস্থিতি অনুকূল রাখার জন্য সমিতির সহিত আমাদের সংযোগ ঘনিষ্ট ছিল্ শ্রদ্ধেয় ˘ বঙ্গচন্দ্র মহাস্থবির, ˘ দুর্যোধন মহাস্থবির ও ˘ শশীমোহন মহাস্থবির মহোদয়গণের দলগত প্রতিনিধি গ্রহণের সুপারিশ-পত্র সমিতির দপ্তরে

এখনও জমা থাকিতে পারে। সমিতির গঠনতন্ত্রে এই নিয়ম কখনো ছিল না। চৌদ্দ বৎসরের বিবাদ মীমাংসার জন্যই সাময়িকভাবে ইহা করিতে হয়। কার্যকরী কমিটির সদস্য তালিকা দৈনিক 'পাঞ্চজন্য'-এ প্রকাশিত হইলে দেখা গেল- কোন গ্রামের পক্ষে সম্পাদকের পদ লাভ হইয়াছে, তখন নির্বিবাদে মিলন ঘটিয়া গেল।

এই মিলনের পর নীতিগতভাবে সমাগমের খরিদ জমি সমিতিতে আসা উচিত ছিল, তাহা হইলে তথায় সমিতির নিজস্ব অফিস নির্মিত হইয়া স্বাধীনভাবে সমাজোন্নতির কার্যে আত্মনিয়োগ করিতে পারিত। আর, বিহার ধর্মোন্নতির প্রতিষ্ঠানে পরিণত হইত। কিন্তু তাহা না করিয়া ত্রিশ বৎসর জাতীয় সম্পত্তির উপসত্ত্ব ভোগ করিয়া অবশেষে জমিটা এক প্রতিষ্ঠানকে কৌশলে দেওয়া হইল- মিলনের সময় যার জন্ম হয় নাই।

মহাসভার বিষয় নির্বাচনী সভায় থানা-ভিত্তিক প্রতিনিধি লইবার বিষয় আমরা উত্থাপন করি। চট্টগ্রামের ১৪টি থানায় বৌদ্ধদের বাস। জনসংখ্যানুপাতে কোন থানা হইতে এক বা একাধিক, কোথাও দুই থানায় একজন, এইরূপে ১২ জন সদস্য নির্বাচিত হইবেন। সভাপতি তাঁহার কাজের সুবিধার জন্য ২ জনকে মনোনীত করিবেন। তাহা হইলে গণতান্ত্রিক নিয়মে কার্যকরী কমিটি গঠিত হইত। কিন্তু সমাজে ভিন্ন ভিন্ন নির্বাচন-কেন্দ্র হওয়ার মত তখন কোন সংস্থা ছিল না। কাজেই নিকায়-ভিত্তিক কমিটি গঠিত হইল। পরবর্তী নির্বাচন যাহাতে প্রতিনিধিমূলক হইতে পারে তজ্জন্য আন্দোলন আরম্ভ হয়। আমরাও ইহাতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করি। ফলে রাঙ্গুনিয়া, সাতকানিয়া, নিজামপুর, নোয়াখালী, ত্রিপুরা প্রভৃতি বৌদ্ধ সমিতি গঠিত হয়। প্রত্যেক গ্রামের সহিত থানা ও কেন্দ্রীয় সমিতির সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা চলে। উহার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৩৯ ইংরেজীতে পাহাড়তলী মডেল স্কুলে গ্রামবাসীর এক সাধারণ সভায় আমার সভাপতিত্বে ও মেহাঙ্গবাবুর সম্পাদকত্বে 'মহামুনি পল্লী উন্নয়ন সমিতি" গঠিত হয়। পরিতাপের বিষয় সেই মিলনের এক বৎসরের মধ্যেই বৌদ্ধ সমিতির শ্রদ্ধেয় সভাপতি অগ্রমহাপণ্ডিতের আকস্মিক তিরোধানে সমাজ আবার দ্বিধা বিভক্ত হইয়া পড়িল। সমাজের কিছু লোক ১৯০৮ ইংরেজীর ভুলের পুনরাভিনয় করিয়া নির্বাচন ও মনোনয়ন ব্যতীত আবার একজনকে সভাপতি করিয়া বসিলেন। অপরপক্ষে ইহার প্রতিবাদ করিলেন। ইহাতে গঠনমূলক সকল কার্যে বাধার সৃষ্টি হইল। সমাজে প্রকৃত গণচেতনা কবে জাগ্রত হইবে ভবিষ্যতই জানে। মুচ্ছদ্দীবাবুদের পরিকল্পিত উপায়ে বিচার ও মীমাংসা না হওয়ায় বিরক্ত হইয়া

দেশে গেলে আমার বিরুদ্ধে ফৌজদারীর প্রস্তাব প্রচার করিয়াছেন। ঐ প্রসঙ্গে লিখিত আমার উক্তি উল্লেখ করিয়াছেন– "ভন্তে লিখিয়াছেন–" সমাজে আমার মত (পণ্ডিত) ভিক্ষু সংখ্যায় খুব বেশী নাই, আমা অপেক্ষা উন্নত শত শত ভিক্ষুর প্রয়োজন।" [- শেষ বক্তব্য, ৫৩ পৃঃ] আমরা পণ্ডিত বলিয়া উহা লিখি নাই, সমাজে এমন কোন কোন অঞ্চল ছিল যাহাতে 'পণ্ডিত ভন্তে' বলিতে এক নামেই ধর্মাধারকে বুঝিত- তাহাতে আমি সঙ্কোচিত ছিলাম। কারণ, আমার তেমন বিদ্যা-বুদ্ধি নাই। তথাপি কেহ কেহ আদর করিয়া অন্ধ-পুত্রকে পদ্মালোচন বলিলে- সেখানে যুক্তির কথা গৌণ হইয়া পড়ে। কাহারো মাথায় শিং বাঁধিয়া দিয়া তাহাকে 'গরু' বলার ন্যায় তিনি বন্ধনীর মধ্যে 'পণ্ডিত' শব্দ জুড়িয়া দিয়া আমাকে পণ্ডিতমানী কলিলেন! তাঁহার ইচ্ছাই পূর্ণ হউক! যদি কেহ বন্ধনীর মধ্যে 'মূর্খ' শব্দ জুড়িয়া দেয় তবে কেমন হয়?

'দক্ষিণার থালা' [- শেষ বক্তব্য, ৫৬ পৃঃ] - চিরদিন ভিক্ষুর সম্মুখেই ছিল। তাহাতে পুণ্যার্থীরা ভিক্ষুকে দান করেন। দাতাদের সামনে কেহ যদি তাহা অপহরণ করে, দাতারা তাহাতে বাধা দিবেন ইহা স্বাভাবিক। গৃহীরা ভিক্ষুদের ভরণপোষণ নির্বাহ করেন, তজ্জন্য তাঁহারা জোটবদ্ধ হইয়া ভিক্ষুদের দক্ষিণা অপহরণ বা ডাকাতি করেন কি? এমতাবস্থায় স্বার্থসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের প্ররোচণায় কাড়াকাড়ি হইলে প্রকৃত দোষী কে-তাহা চিন্তা না করিয়া মুচ্ছদ্দীবাবু ওকালতি লইলেন! প্রায় অর্ধশতাব্দী পূর্বে ভিক্ষুরা দক্ষিণা না লওয়ার জন্য 'জিনশাসন সমাগম' প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই সমাজে উহা ব্যর্থ হইয়াছে। ভিক্ষুদের দক্ষিণা না দিলে শীল-বিশুদ্ধির সহায়তা হয়– তাহাতে আমরা অসম্মতি নহি। কিন্তু কেহ দিবে, আর কেহ কাড়িয়া লইলে বা ডাকাতি করিলে কি তাঁহারা শীলবান হইবেন? ইহা সমাজের সার্বজনীন ব্যাপারে, অপরিণত মস্তিষ্কের খেয়াল–খুঁশি মত চলিবে না। তিনি যেই প্রত্যক্ষদর্শী বিদেশী ভিক্ষুর কথা বলিয়াছেন, তিনি থেরবাদী ভিক্ষু নহেন। মহাযানী লামা বা বিনা-উপসম্পদায় ভিক্ষু। শিক্ষার্থীরূপে নালন্দা পালি ইনস্টিটিউট-এ আসিয়া ভিক্ষুর বেশ অনুকরণ করিয়াছেন। তাঁহাদের দেশে লামারা বিবাহ করেন। তিনি পঞ্চাশ টাকা পকেটে লইয়া (উহা কোর্টে জেরায় তাঁহার স্বীকৃতি) এক মানহানি মোকদ্দমায় আসামীপক্ষে সাফাই সাক্ষ্য দেওয়ায় আসামীর দুইশ টাক জরিমানা অনাদায়ে দুইমাস জেল হইয়াছে। সর্বোপরি যাহাদের 'বানাওট' বিবরণীতে মুচ্ছদ্দীবাবু পক্ষাবলম্বন করিলেন- তাহারাই তাঁহার পুত্র শ্রীনীহারকান্তি মুৎসুদ্দি ও অন্যান্যদের নামে এক জাল পুস্তিকা তৈরি করে এবং প্রেস, ঠিকানা, রাষ্ট্র,

প্রচারকেন্দ্র জাল করিয়া সর্বত্র প্রচার করিয়াছে। যাঁহাদের নামে উহা ছাপাইয়াছে– তাঁহাদের প্রতিবাদ সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত জালিয়তেরা তাহাদের জামাইবাবুদের মাধ্যমে গোপনে উহা বিতরণ করিতেছে। তাহাদের দ্বারা আরো কত জঘন্য কাজ হইতেছে। ১৯৫৫ ইংরেজী হইতে এই ধর্মাঙ্কুর বিহারের বহু ভিক্ষু-শ্রমণ নানা অত্যাচারে চীবর ও স্থান ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। এইসব নোংরা লোকের পক্ষালম্বন করা মুচ্ছদ্দীবাবুর মত উকিলের পক্ষেই সম্ভব!

"দানের ফলে মহামুনি মন্দিরের মালিক ভিক্ষু-সংঘ"। [- শেষ বক্তব্য, ৩৩ পৃঃ] তজ্জন্য মোকদ্দমা না করায় "সংঘনায়ক বর্তমান ও ভবিষ্যত জনগণের নিকট কর্তব্য ও দায়িত্বহীনতার জন্য দায়ী থাকিবেন"থ– এর লেখকের পক্ষে- ভিক্ষুদ্বারা নির্মিত, সংঘকে প্রদত্ত, সাংঘিক বিহার হইতে অধ্যক্ষকে অপসারণের অপপ্রয়াসের বিরুদ্ধে ন্যায়ালয়ের আশ্রয় লইলে নিন্দা করা আশ্চর্যজনকই বটে! ইহা স্ব-বিরোধী কথা নয় কি? নিজেদের বাসস্থানে ভিক্ষুদের 'অল্পাংশ বা অধিকাংশ দায়কের সম্মতি ও নিমন্ত্রণের' প্রয়োজনীয় কি? সমাজে কিছু লোকের বুদ্ধির আরষ্টতা জন্মিয়াছে, তজ্জন্য তাহারা আক্রান্ত ও আক্রমণকারীর তারতম্য বুঝিতে পারে না।

পাহাড়তলী মহানন্দ বিহার দখলের ন্যায় ধর্মাঙ্কুর বিহার দখলের ষড়যন্ত্র রাউজানে হইয়াছে, বিশ্বস্তসূত্রে আমরা এই খবর পাই। সেইদিন মহাবোধি সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক শ্রীদেবপ্রিয় বলিসিংহ মহাশয়ের সাক্ষাতে কোন বিদেশী মহাস্থবিরও তাহা স্বীকার করেন। অন্যায়ের অংশ চারি প্রকারে গৃহীত হয়– যথাঃ কৃত, কারিত, অনুমোদিত ও প্রশংসিত। নালন্দার কোন ভিক্ষুর নিকট মুচ্ছদ্দীবাবুর লিখিত পত্রে অন্যায়ের অংশগ্রহণের প্রমাণ মিলে।

তিনি 'আমার নিবেদন'-এ [১৫।৮।৫২ ইং] বলিয়াছেন ঃ "ভিক্ষুর পক্ষে ফৌজদারীতে সোপর্দ হওয়াই দণ্ডভোগ হইতে গুরুতর মর্যাদা হানিকর।" জানি না– উক্তি প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্বে বীমা কোম্পানির এজেন্টরূপে লোকের টাকা তছরূপ করিয়া ফৌজদারীতে সোপর্দ হইয়া দণ্ডিত কোন নিকায়-প্রধান ভিক্ষুর প্রতিও প্রযোজ্য কিনা? তিনি কলিকাতা হইতে নীত ব্যারিস্টারের প্রভাবে জেল হইতে খালাস পাইয়াছিলেন। ঘা শুকায়– দাগ থাকে। সিংহলের বন্দরনায়ক হত্যাকারী সোমরামাকে প্রথমতঃ বিনয়-বিচারে পারাজিকা অপরাধে চীবরত্যাগে বাধ্য করা হয়। রাজকীয় বিচারে সে জীবন-ভিক্ষা প্রার্থনা করে। যদি ভিক্ষা পাইত- তবে তাহার ভিক্ষুত্ব বজায় থাকিত কি? ব্যারিস্টারের প্রভাবে জেলমুক্ত হইতে পারে, কিন্তু পাপ্পারাজিকামুক্ত হয় কি? এবার (২১/৭/৬৪ ইং)

মুচ্ছদ্দীবাবুর শুভেচ্ছাধন্য ভিক্ষুটি সহ বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহারের ৪ জন ভিক্ষু সম্মিলিতভাবে সমাজবিরোধী আচরণের জন্য (দৈনিক বসুমতীর সম্পাদকের ভাষায়) ফৌজদারীতে সোপর্দ হইয়া মাননীয় প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের বিচারে প্রত্যেকের ৫০ টাকা করিয়া অর্থদণ্ড, অনাদায়ে ১০ দিন করিয়া কারাদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া এক সর্বভারতীয় রেকর্ড স্থাপন করিয়াছে। কলিকাতার কয়েকখানি প্রধান ইংরেজী ও বাংলা দৈনিক পত্রিকার মাধ্যমে দেশ-বিদেশে প্রচারিত হইয়া দণ্ডিত ভিক্ষুর! আন্তর্জাতিক পরিচিতি ও খ্যাতি লাভ করিয়াছে। এই দণ্ডপ্রাপ্তি-ফৌজদারী সোপর্দ হওয়া অপেক্ষা কতটুকু মর্যাদাকর মুচ্ছদ্দীবাবু এবার তাঁহার রায় দিবেন কি?

বিহারের মালিক ভিক্ষু-সংঘ

শতাব্দী কাল থেরবাদ প্রচলিত হইলেও এদেশের বৌদ্ধগণের মধ্যে অনেকে বিনয়-বিধান মানিতে প্রস্তুত নহেন– বিশেষতঃ বিহারের মালিক সম্বন্ধে। 'বিহার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বিনয় অনুসারে উহার সমাধান হওয়া বাঞ্ছনীয়' বলায় মুচ্ছদ্দীবাবু ক্রোধান্বিত হইয়া লিখিয়াছেন ঃ "তিনি কোন মুখে বিনয়-বিগর্হিত প্রস্তাব করিলেন"? [- শে, ব, ৩০ পৃঃ] 'বিনয় অনুসারে সমাধান' তাঁহার নিকট বিনয়-বিগর্হিত হইল! এইরূপ উক্তি কোন স্থিরমস্তিষ্ক উপাসকের নিকট প্রত্যাশা করা যায় কি?

ভিক্ষুর সম্বন্ধে 'মধ্যম নিকায়'-এ বলা হইয়াছেঃ "কেহ স্বল্প বা প্রচুর ভোগ-সম্পত্তি ও স্বল্প বা প্রচুর আত্মীয়-স্বজন পরিত্যাগ করিয়া আগার হইতে অনাগারিক প্রব্রজ্যায় প্রব্রজিত হয়।" [-শ্রামণ্যফল-সূত্র, ৬৫ পৃঃ] সুতরাং প্রব্রজিতের আর পৈত্রিক-সম্পত্তির অধিকার থাকে না। গৃহীরা ভিক্ষুর সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইতে পারে না।

প্রথম অবস্থায় ভিক্ষুদের জন্য বৃক্ষমূল শয্যার ব্যবস্থা ছিল। পরে সাংঘিক ও পুদ্গলিকভাবে বিষয়-সম্পত্তি গ্রহণের নির্দেশ হয়। বুদ্ধত্ব- লাভের পর দ্বিতীয় বর্ষায় ভগবান বুদ্ধ সহস্র ভিক্ষুসহ রাজগৃহে উপনীত হন। রাজা বিম্বিসার তাঁহার উপদেশ শ্রবণ করিয়া স্রোতাপন্ন হইলেন। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া ভিক্ষু-সংঘের বাসোপযোগী বেণুবন উদ্যান বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সংঘকে দান করিলেন। এই উপলক্ষে বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে উদ্যান গ্রহণের নির্দেশ দিয়াছেন।

[-মহাবগ্গো, ৫০ পৃঃ]

তখনও ভিক্ষুদের বিহার গ্রহণের নির্দেশ হয় নাই। ভিক্ষুরা অরণ্যে, বৃক্ষমূলে রাত্রিযাপন করেন। রাজগৃহ-শ্রেষ্ঠী উদ্যান-ভ্রমণে গিয়া এই অবস্থায় ভিক্ষুদিগকে দেখিলেন। তিনি অনুরোধ করিলেন ঃ "ভন্তে! যদি আমরা বিহার নির্মাণ করিয়া দান করি- আপনারা তাহাতে বাস করিবেন কি?" তাঁহারা বুদ্ধের আদেশ পাইলেনঃ "ভিক্ষুগণ! বিহার, অর্ধযোগ, প্রাসাদ, হর্ম্য ও গুহা এই পঞ্চবিধ আশ্রয় গ্রহণের নির্দেশ দিতেছি।" রাজগৃহ-শ্রেষ্ঠী ৬০ খানা বিহার নির্মাণ করিয়া ভগবানকে নিবেদন করিলেন ঃ "প্রভু! আমরা পুণ্যার্থী ও স্বর্গকামী হইয়া বিহারগুলি নির্মাণ করিয়াছি, এখন কি করিব?" বুদ্ধ বলিলেন ঃ "শ্রেষ্ঠি! বিহারগুলি আগত, অনাগত চতুর্দিকের ভিক্ষু-সংঘকে দান করুন।"

[-চূলবগ্‌গো, ২৬ পৃঃ]

সেই সময় আয়ুষ্মান পিলিন্দবচ্ছ আশ্রম করিবার মানসে একস্থান পরিষ্কার করিতেছেন। রাজা বিম্বিসার তাঁহাকে আরামিক ও সেবক দানের ইচ্ছা করিলেন। এই উপলক্ষে বুদ্ধ ভিক্ষুদিগকে আরামিক গ্রহণের অনুমতি দিলেন। তদনুসারে রাজা ৫০০ গৃহস্থ বিশিষ্ট এক গ্রাম দান করিলেন। [-মহাবগ্‌গো, ৩০০ পৃঃ]

ক্রমশঃ ভিক্ষুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাইল। শ্রাবস্তীর এক গ্রামে সপ্তদশবর্গীর ভিক্ষুদের নির্মিত বিহার হইতে তাঁহাদিগকে অসন্তুষ্ট ষড়বর্গীয় ভিক্ষুরা বাহির করিয়া দিলেন। বুদ্ধ ইহাতে সাংঘিক বিহার হইতে ভিক্ষু-বিতাড়ন নিষিদ্ধ করিলেন।

[-চুলবগ্‌গো, ৩১৭ পৃঃ]

এইরূপে গৃহীত সংঘসম্পত্তির মধ্যে শ্রাবস্তীর অদূরে এক গ্রাম্য-বিহার পুদগলিক করিবার দরুণ বুদ্ধ কর্তৃক সংঘসম্পত্তি ত্যাগ ও বিভাগের অযোগ্য বলিয়া ঘোষিত হয় ঃ "ভিক্ষুগণ! পঞ্চবিধ সম্পত্তি অবিভাজ্য; সংঘ, গণ কিংবা ব্যক্তি কর্তৃক বিভক্ত হইলেও তাহা অবিভাজ্য থাকিবে। যে বিভাগ করিবে তাহার থুল্লচ্চয় (গুরুতর) অপরাধ হইবে। যথাঃ উদ্যান, উদ্যানবাস্তু, বিহার, বিহারবাস্তু এবং মঞ্চপীঠ, গদী-বালিশ, লৌহের ডেক-কড়াই-থালা-গ্লাস, বাইশ-কুঠার, রণ্‌তা-কোদাল, খন্তা, বেত-বাঁশ, মুঞ্জ-বর্বজ-তৃণ, মৃত্তিকা, কাষ্ঠদ্রব্য, মাটির ভাজন প্রকৃতি।" [- চূলবগ্‌গো, ৩২১ পৃঃ] এই সমুদয়ের বিভাগ ও পরিত্যাগ চলিবে না।

এইরূপে অছি পরিষদে গচ্ছিতের ন্যায় সংঘ-সম্পত্তি কেহ নষ্ট করিতে পারিবে না। ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, শ্রামণের, শ্রামণেরী ও শিক্ষানামা এই সমধর্মী পাঁচ শ্রেণীর অনাগারিকেরা তাহা ব্যবাহার করিবেন মাত্র। সংঘ-সম্পত্তি বৃদ্ধির জন্য বিনিময় ছাড়া অন্য কোনরূপ হস্তান্তর চলিবে না। কোন ভিক্ষুর নির্মিত বা দানপ্রাপ্ত

ব্যক্তিগত সম্পত্তিও তাঁহার মৃত্যুর পর সংঘ-সম্পত্তিতে পরিণত হইবে। তিনি উপ-সম্পদা ত্যাগ করিলে কিংবা অভিক্ষোচিত কাজ করিলে সংঘই তাঁহার সম্পত্তির মালিক হইবেন। সমধর্মী পাঁচজনের মধ্যে "অচ্চয়দানং ন রূহতি" [টীকা] অর্থাৎ মৃত্যুর পর কেহ পাইবে বলিয়া উইল করিলেও তাহা টিকিবে না। সংঘই উহার মালিক হইবেন।

এইরূপে সাংঘিক বিহারগুলি দাতাদের দানে পরিপুষ্ট হইয়া কালে সহস্র সহস্র অধ্যাপক ও ছাত্রের আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হইয়াছিল। পৃথিবীর নানা দেশ হইতে শিক্ষার্থীরা তাহাতে যোগদান করিতেন। এক-একটি বিহার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়িয়া প্রসারিত ছিল। ধ্বংসের পূর্বে বৌদ্ধ বিহারগুলিকে শত্রুরা সৈন্যের দুর্গ মনে করিয়াছিল। এখনও লঙ্কা, ব্রহ্মা, শ্যাম, কম্বোজ, চীন, জাপানের বিহারগুলি শত শত ভিক্ষুর বাসস্থান ও আবাসিক শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান।

বুদ্ধের জীবদ্দশায় ভিক্ষুরা যেমন তাঁহাকে ভন্তে বা প্রভু বলিয়া সম্বোধন করিতেন, তাঁহার অবর্তমানে সেইরূপ বয়োবৃদ্ধ ভিক্ষুকে কনিষ্ঠ ভিক্ষু 'প্রভু' বলিয়া সম্বোধন করিবার নির্দেশ 'মহাপরিনির্বাণ সূত্র'-এ আছে। 'প্রাতিমোক্ষ উদ্দেশ' প্রভৃতি বিনয়কর্ম 'থেরধেয়্য' অর্থাৎ সমবেত ভিক্ষুগণের মধ্যে বয়োজ্যোষ্ঠেরই আয়ত্ব। সেইরূপ অগ্রগমন, অগ্র-পাদোদক, অগ্র-আসন, অগ্রদান, অগ্র-সম্মান, শরণ-শীল, প্রব্রজ্যাদান সমস্তই বয়োজ্যেষ্ঠেরই প্রাপ্য। সাংঘিক বিহারের প্রাধান্য ও আবাসিক ভিক্ষুদের মধ্যে বিজ্ঞ বয়োজ্যেষ্ঠ থেরের অধিকারে থাকে। এইরূপ থেরকে পালি ভাষায় 'সংঘথেরো, সংঘপিতরো, সংঘ-পরিনায়কো' বলা হয়। বিহারাধিপতি ও বিহারাধ্যক্ষ তাহারই নামান্তর। 'গণক মোগ্গল্লান সূত্র'-এ তাঁহার দশবিধ প্রসাদনীয় গুণের বিষয়ে বর্ণিত হইয়াছে। যথাঃ-

- তিনি শীলবান হইবেন, প্রাতিমোক্ষ-শীলে সংযত থাকিবেন, আচার-গোচরসম্পন্ন ও অণুমাত্র দোষের প্রতিও ভয়দর্শী হইবেন।
- তিনি বহুশ্রুত, শ্রুতিধর ও শ্রুতিভাণ্ডার হইবেন; আদি-মধ্য-অন্ত্য কল্যাণধর্ম অর্থ সহ হৃদয়ঙ্গম করিয়া উহা প্রচারে ব্রতী থাকিবেন।
- তিনি চতুর্বিধ প্রত্যয়ে সন্তুষ্ট থাকিবেন।
- তিনি চতুর্বিধধ্যানের অনায়াসলাভী হইবেন।
- আর– তিনি ষড়বিধ অভিজ্ঞায় পারদর্শী হইবেন।

যেই স্থবিরের মধ্যে একম্বিধ গুণরাজি বিদ্যমান তাঁহাকে সকলে সৎকার, গৌরব, পূজা ও মান্য করিবেন এবং তাঁহার আশ্রয়ে ভিক্ষুরা অবস্থান করিবেন। [-মধ্যমনিকায়, ৩য় ভাগ] কোন অভিক্ষোচিত কাজের নিমিত্ত ভিক্ষু-সংঘের বিচারে

অপরাধী না হওয়া পর্যন্ত আজীবন তিনি বিহারাধিপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকিবেন। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর শত শত বৎসরে বৌদ্ধ-ভিক্ষুরা নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়াছেন। সেই সময়ের রাজাদের দানপত্রাদিতে বিশেষ সম্প্রদায়ের নামোল্লেখ দেখা যায়। মহারাজ বন্যগুপ্তের তাম্র শাসন পাঠে জানা যায়, তিনি ৫০৬ খৃষ্টাব্দে মহাযান বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের বিহারের জন্য ৪০০ দ্রোণ জমি দান করিয়াছিলেন। [- আবোল-তাবোল, ৪ পৃঃ] ইহাতে প্রমাণিত হয় যে, এক সম্প্রদায়ের বিহারাদিতে অন্য সম্প্রদায়ের অধিকার নাই। বর্তমানে লঙ্কা, ব্রহ্মা, চীন, জাপান প্রভৃতিতে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ভিক্ষু আছেন, তাহাতে এই নীতিই অনুসৃত রহিয়াছে।

পক্ষান্তরে সাংঘিক বিহারাদিতে পূজা-উপাসনা ব্যতীত গৃহীদের কোন অধিকার নাই। গৃহীরা দায়ক। দাতা ও বিক্রেতা প্রদত্ত সম্পত্তির মালিক নহেন। গ্রহীতাই উহার প্রকৃত মালিক। এই নীতি না মানিয়াই অনেক ক্ষেত্রে অশান্তির সৃষ্টি হইয়াছে। ১৯৩৯ খৃষ্টাব্দে রেঙ্গুন ধর্মদূত বিহারেন জন্য ভিক্ষু ও দায়কের মধ্যে ১০২ এবং ১৪৩ ধারার মোকদ্দমা দেখিয়া তথাকার বর্মী জজ আশ্চর্যান্বিত হইয়াছিলেন। ইহাতে বৌদ্ধসমাজ অপূরণীয় ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। এইরূপে আকিয়াব, চট্টগ্রাম, কলিকাতার বিহারগুলি গৃহী ও ভিক্ষুর সংঘর্ষে ধ্বংস হইতেছে।

১৮৯৯ অব্দে পূণ্যার্থী দায়কদের দ্বারা চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহার নির্মিত হয়। তখন মাথের দলের ভিক্ষুর অভাব ছিল না। তথাপি এই বিহার সংঘরাজ আচার্য পূর্ণাচার প্রমুখ থেরবাদী ভিক্ষু-সংঘকে প্রদত্ত হয়। অন্ন, বস্ত্র, বিহার ও ঔষধ দানের দলিল সম্পাদন করা তখনকার সমাজে প্রচলিত ছিল না। একথা সত্য যে, অদত্তবস্তু ভিক্ষুরা ব্যবহার করেন না। সংঘের প্রতিনিধি হিসাবে শ্রদ্ধেয় অগ্রমহাপণ্ডিত ধর্মবংশ মহাস্থবির বিহারের অধ্যক্ষ হইলেন। তাঁহার নামে রাজকীয় জরিপও খতিয়ান হইয়াছে। সেই পরম্পরা অধ্যক্ষ এখনও বিহারে অধিষ্ঠিত আছেন। এমতাবস্থায় প্রায় অর্ধশতাব্দীকাল পরে মুচ্ছদ্দীবাবু জিগীর তুলিলেন, যেহেতু সকল দাতার চাঁদায় বিহার নির্মিত হইয়াছে– সেই কারণে তাহা সকল দলকে ভাগ করিয়া দিতে হইবে। তাহা কি সম্ভব? সকল দলের চাঁদায় নির্মিত হোয়ারাপারা সুদর্শন বিহার কি ভাগ করা চলে? থেরবাদ উপসম্পদা গৃহীত হইলে এই সাংঘিক বিহারে সম-অধিকার জন্মিবে। অথবা 'বৌদ্ধ সমাগম'-এর জমিতে অপর বিহার নির্মিত হইতে পারে।

ভিক্ষু ও গৃহীদের মধ্যে বিহার নিয়া অশোভন টানাটানির দরুণ বাংলাদেশের

বিহারগুলির দৈন্যদশা ঘুচিল না। ভিক্ষুদের পক্ষে সর্বস্ব ছাড়িয়া আসিয়াও মরণ-সময়ে আত্মীয়-স্বজনদের আশ্রয় লইতে হয়। গৃহীরা গৃহের এবং বিহারে উভয়ত্র মালিক হইবেন, আর ভিক্ষুরা শূন্যে ভাসিবেন– এই ধর্ম বুদ্ধের প্রচারিত নহে। ভিক্ষু-সংঘই বিহারের মালিক– গৃহীরা নহে। 'মহাপরিনির্বাণ সূত্র'-এ বলা হইয়াছে ঃ "অনাগতে সংঘো রক্‌খিস্‌সতি ইমং সাসনং"– ভবিষ্যতে ভিক্ষু-সংঘই বুদ্ধের ধর্ম রক্ষা করিবেন। ভিক্ষু ছাড়া কোটি কোটি গৃহী এ ধর্ম রক্ষা করিতে পারে নাই, পারিবে না। অথচ সেই বৌদ্ধরাই বিহার ও ভিক্ষু-সংঘের প্রতি বুদ্ধের বিনয় বহির্ভূত নানাবিধ অপ-আচরণের দ্বারা বুদ্ধের ধর্মকে ধ্বংসের পথে আগাইয়া দিতেছেন– অপর কেহ নহে।

সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু।

সমাপ্ত

সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১ বৌদ্ধ সংস্কৃতি– মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন, ১৯৫২ ইং
২ বৃহৎ বঙ্গ– ডঃ দীনেশ চন্দ্র সেন প্রণীত
৩ গৌড়পাদ তরঙ্গিণী
৪ হরপ্রসাদ রচনাবলী– ডঃ শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ১৯৫৬ ইং
৫ বাঙালা সাহিত্যের কথা– ডঃ শ্রীসুকুমার সেন, ১৯৪৫ ইং
৬ বঙ্গভাষা ও সাহিত্য– ডঃ দীশেশচন্দ্র সেন প্রণীত
৭ ভারতবর্ষ– আশ্বিন, ১৩৫৭ বাং
৮ গোর্খবিজয়– শ্রীপঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত, ১৩৫৬ বাং
৯ চাক্‌মা জাতির ইতিহাস– মাধবচন্দ্র চাক্‌মা প্রণীত, ১৯৪০ ইং
১০ সদ্ধর্মরত্নাকর– ধর্মতিলক স্থবির প্রণীত, ১৯৩৫ ইং
১১ সংঘরাজ সারমেধ মহাথের– এর জীবনী–
Ashin Wimala Thera, ১৯৬৩ ইং
১২ বৌদ্ধবন্ধু পত্রিকা– ১ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা
১৩ মাতৃপূজায় মানবধর্ম– শ্রীউমেশচন্দ্র মুচ্ছদ্দী প্রণীত, ১৯২৬ ইং
১৪ বড়ুয়া জাতি ঐ ১৯৫৯ ইং
১৫ সভাপতির ভাষণ ঐ ১৯৫৬ ইং
১৬ গোজেন লামা– শ্রীত্রিপুরচন্দ্র সেন সংকলিত, ১৩৬৬ বাং
১৭ সৃষ্টি প্রথ ঐ ১৩৭০ বাং
১৮ সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ৫২শ বর্ষ, বঙ্গ সাহিত্যে শতবর্ষের বৌদ্ধ অবদান– ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়ার বক্তৃতা– ১৯৪৬ ইং

১৯ বৌদ্ধ পরিণয় পদ্ধতি– ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া, ১৯২৩ ইং
২০ চণ্ডীদাস–
২১ রাজমালা– শ্রীকালী প্রসন্ন সেন বিদ্যাসাগর সম্পাদিত, ১৩৩৬ ত্রিপুরাব্দ
২২ চট্টগ্রামের ইতিহাস– শ্রীপূর্ণচন্দ্র চৌধুরী কৃত
২৩ গোবিন্দচন্দ্র গীত– দুল্লভ মল্লিক কৃত
২৪ চট্টগ্রামের ইতিহাস (১ম, ২য় খণ্ড) – মাহবুব-উল্ আলম প্রণীত ১৯৫৫ ইং
২৫ রবিবাসরীয় আনন্দবাজার, ২৩/২/৬৪ ইং
২৬ আমার জীবন– কবি নবীনচন্দ্র সেন প্রণীত, ১৯০৮ ইং
২৭ মহাবগ্গ– ষষ্ঠ সংগায়ন সংস্করণ, ১৯৫৬ ইং
২৮ চূলবগ্গ– ঐ ঐ
২৯ ধর্মদূত– (হিন্দী মাসিক পত্রিকা) মার্চ, ১৯৫২ ইং
৩০ রামধন স্মৃতিভাণ্ডার (কার্যবিবরণী) – ১৯২৮ ইং
৩১ আবোল-তাবোল– পণ্ডিত প্রজ্ঞানন্দ স্থবির, ১৯৫১ ইং
৩২ আমার মন্তব্য– শ্রীউমেশচন্দ্র মুচ্ছদ্দী, ১৯৫২ ইং
৩৩ মূলতত্ত্ব– পণ্ডিত শ্রীপ্রিয়দর্শী স্থবির প্রণীত, ২৪৯৫ বুদ্ধাব্দ
৩৪ পূর্ণাচার ধর্মধারীর জীবন চরিত– শ্রীপ্রজ্ঞালোক মহাস্থবির প্রণীত ১৯১০ ইং
৩৫ মধ্যমনিকায় ৩য় ভাগ, ষষ্ঠ সংগায়ন সংস্করণ, ১৯৫৬ ইং
৩৬ দীর্ঘ নিকায়, ১ম ভাগ ঐ ঐ

ভন্তে, যথা সময় 'অধিমাস বিনিশ্চয়'খানি স্নেহোপহার পেয়েছি। আপনার বইখানি এমন চমৎকার হয়েছে– আমার মনে হয় ইহা দ্বারা ভবিষ্যতে ভিক্ষু তথা বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজ উপকৃত হবেন, তা কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না। আপনার এই বইটির মধ্যে যে অধিমাস পঞ্জি সন্নিবেশিত করেছেন তাতে বইটির শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হয়েছে। বর্তমান বর্ষে যদিও নানা কারণে বর্ষাবাসের গোলযোগ দেখা যাচ্ছে আশা করি ইহার দ্বারা ভবিষ্যতে এমন গোলযোগ দেখা যাবে না..... ১৯/১০/৬৩ইং

–ভিক্ষু রতন জ্যোতি
সাতবাড়িয়া

বাংলাদেশে থেরবাদ আদর্শ উৎপত্তির তীর্থ স্থান
ঐতিহাসিক হাঞ্চার ঘোনা ধর্মচক্র স্মৃতি স্তম্ভ ও পাষান সীমা